খ. প্রেমভাবনা

'কল্লোল যুগ' তীব্রভাবে 'আমি স্বেচ্ছাচারী' কলধ্বনি তোলার পরের দিনগুলোয় সাহিত্যের বিষয় হিসেবে নতুন করে প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠে 'প্রেম'। তুমুল রাজনৈতিক উৎকণ্ঠায় থাকা গোটা পৃথিবীতেই 'বিশ্বাস' তখন একটা পদবী মাত্র! হয়তো সে-কারণেই এই নব্য প্রেমজ প্রতিবিধান প্রয়োজন ছিলো। প্রেমেন্দ্র মিত্র অ্যান্ড কোং-এর হাতে ছিলো "মানুষের মানে চাই, গোটা মানুষের মানে..."-র ফেস্টুন। রবীন্দ্রনাথের আর্ষ প্রেমকল্প থেকে বেশ খানিকটা সরে এসে পাশ্চাত্যের ধাঁচে এ এক এমন প্রস্তাবনা, যেখানে যৌনজ্বর, শারীর-আশ্লেষ প্রভৃতি অনায়াসেই ঠাঁই পাবে। চটজলদি চোখ বোলালে এমত সাহিত্যবৈশিষ্ট্য নিদেনপক্ষে 'কল্লোল' থেকে 'কৃত্তিবাস' অবধি আমরা বহাল দেখব। বিনয়ের কাব্যজীবন এবং জীবনকাব্য এই সময়পর্যায়ের মধ্যেই মুখ্যত মহীরুহ হবে। তাই বিনয়ও এর ব্যতিক্রম নন। 'নক্ষত্রের আলোয়', বিশেষ করে তাঁর 'ফিরে এসো, চাকা', 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা' তো উচ্চাঙ্গের দার্শনিক ক্যামোফ্লাজে মানুষ-মানুষীর কাব্যই বটে। তবে 'বাল্মীকির কবিতা' (১ম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৮৩)-র পর্যায়ে বিনয়ের বেশ কিছু প্রেমের কবিতা কোনও অজ্ঞাত কারণে উৎকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। যেমন, 'বসার পরে', 'তিন ঘণ্টা পরে', 'কবিতার খসড়া/ ১৫', 'কবিতার খসড়া/ ১৬', 'কবিতার খসড়া/ ১৭', 'কবিতার খসড়া/ ১৮' শিরোনামক কবিতাগুলিকে নেহাত কবিতার আকারে উপস্থিত নীলচিত্র ছাড়া অন্য কিছু বলাটা মুশকিল। এই ট্রমা-র পর বিনয়ের কবিতা ফের স্বাভাবিক হবে, হয়তো সাবলীলও। কেননা, সেইসময় বিনয় ক্রমশ অলংকারহীনতার দিকে ঝুঁকছেন, আধুনিক, উত্তর-আধুনিক সময়কার লেখনীর যা কিনা অন্যতম অভ্যেস। তাঁর 'আমাদের বাগানে', 'আমি এই সভায়', 'এক পঙক্তির কবিতা', 'আমাকেও মনে রেখো', 'আমিই গণিতের শূন্য', 'এখন দ্বিতীয় শৈশবে', 'কবিতা বুঝিনি আমি', 'পৃথিবীর মানচিত্র', 'একা একা কথা বলি', 'বিনোদিনী কুঠী' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থগুলি সালঙ্কারা বর্ণমালার বিপ্রতীপ অবস্থানেই স্বমহিমায় ভাস্বর। এই অধ্যায়টিতে আমরা প্রেমের কবিতায় বিনয়ের পরিবর্তনশীল শব্দচয়ন, কবিতাবয়ন, ব্যক্তি-নারী ও নারীসাধারণীগত সমান্তরাল ও বিবর্তমান ভাবনালোক নিয়ে যথার্থ জহুরির নাড়াঘাঁটা করব।

'অল ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট অব হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেল্‌থ'-এ চাকরিগ্রহণের আগে-পরের সময়টিই তাঁর নক্ষত্রের আলোয় ভিজতে থাকার কাল। প্রাতিষ্ঠানিক ছাত্রত্ব সবে শেষ হয়েছে। কলেজ স্ট্রিট-লাইফ, গায়ত্রী-হাইপ ইত্যাদি তখনও টাটকা। প্রতিহত বা প্রত্যাখ্যাত প্রেম নজরুলকে দিয়ে "আমি চাঁদ নহি, চাঁদ নহি অভিশাপ।/ শূন্য গগনে আজো নিরাশায় আকাশে করি বিলাপ।।"[১] বলিয়েছিলো; সেখানে বিনয় বললেন— "আমি তো চাঁদ নই, পারি না আলো দিতে/ পারি না জলধিকে আকাশে তুলতে।/ পাখির কাকলির আকুল আকুতিতে/ পারবো কি

তোমার পাপড়ি খুলতে?”[২]

কিন্তু, প্রেমবিষয়ক যে ভালোবাসাটিকে তিনি অনাদিঅনন্ত আঁকড়ে রইলেন, তা এই—

“ভালোবাসা একমাত্র ভালোবাসা ভ’রে দিতে পারে মনে
শান্তি এনে দিতে।
কেবল নারীর প্রতি পুরুষের কিম্বা কোনো পুরুষের প্রতি
কোনো নারীর প্রণয় ভালোবাসা।
—এ তো আছে থাকবেই, তদুপরি প্রতিটি বিশেষ্যপদকেই
ভালোবাসা হলো সেই ভালোবাসা যাতে মনে
শান্তি এনে দেয়।
আর এই শান্তি কী বা আমাদের প্রয়োজন?
মনে যদি শান্তি থাকে তবে আর কোনো কিছু
চাওয়ার থাকে না।
যদি বা চাওয়ার থাকে তা এরূপ যাতে মনে
শান্তি ঠিক আগের মতোন থেকে যায়
আমাদের চাওয়া আর পাওয়ার তালিকাগুলি এইভাবে
আমরাই তৈরি ক’রে থাকি।”[৩]

অতএব নারীই বিনয়ের প্রণয়প্রমিতি এবং এই বিষয়ে অন্যান্যদের সঙ্গে তাঁর ফারাক নেই। কিন্তু, তাঁর নারী ঈশ্বরীনাম্নী, তাঁর ভূগোল ঐশ্বরিক। দেবীকে মনে-মনে কামনা করেছেন, নগ্ন করেছেন বলে অবশ্য তাইরেসিয়াসের মতো অন্ধত্ব[৪] পরিণতি হয়নি; কিন্তু, ক্রমদিন নির্বাসন যেন তাঁর উৎখিন্ন উপাসন হয়ে গিয়েছে। মঙ্গলযুগ ইতিহাস করে আসা বাঙালি কবি লিখেছিলেন— “ঈশ্বর মানুষ হয়েছেন/ এবার মানুষ ঈশ্বর হবে।”[৫] জীবনানন্দ-ভক্ত বিনয় বনলতা সেনের মতো মন্ময় দ্বীপকন্যা বানিয়ে না তুলে হিয়ামন-প্রিয়াকে দিলেন মর্ত্যবাসী ঐশিকার আদল। ‘গোধূলি সন্ধির নৃত্য’-এ জীবনানন্দ যদিও আগেই লিখছেন ঈশ্বরীমেয়েকে

নিয়ে— "কয়েকটি নারী যেন ঈশ্বরীর মতো;/ পুরুষ তাদের : কৃতকর্ম নবীন;/ খোঁপার ভিতরে চুলে : নরকের নবজাত মেঘ,/ পায়ের ভঙ্গির নিচে হঙকঙের তৃণ।"[৬]; '১৯৪৬-৪৭'-এ শোনান মাঝি বাগ্‌দির ঈশ্বরী মেয়ের সাথে বিবাহের কিছু আগে-বিবাহের কিছু পরে-সন্তানের জন্মাবার আগে চাঁদের রাতে প্রান্তরে ধানের অদ্ভুত রস খেয়ে ফেলা চাষার নাচের গল্প[৭]। আবার, এই ঈশ্বরী-পরিকল্পনাকে নিতান্তই নাটুকে, ফিউডাল বলে মনে করেছেন চল্লিশের রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী (জ. ১৯২২ খ্রিঃ)। বিশেষত পঞ্চাশের কবিদের রোম্যান্টিসিজ্‌ম, ব্ল্যাক রোম্যান্টিসিজ্‌মের ধরন তাঁর মনে ধরেনি। বলছেন—

"পঞ্চাশের কবিদের মধ্যযুগী যোদ্ধাদের মতো
প্রণয়িনীদের পায়ে প্রার্থনার নিবেদন নতজানু ঢঙে—
আমি মনে করি এই ভঙ্গি নাটকীয়, সামন্ততান্ত্রিক। প্রেমিকাকে
তারা ভাবতেন ঈশ্বরী, আর
কারও ঈশ্বরীটি ভেগে গেলে ফুঁপিয়ে...ফুঁপিয়ে...সে কী কান্না
সে কী দীর্ঘশ্বাস।
মানি, রহস্যের বোধ কবিতায় অন্যতম গুণ,
নারীদেহে রহস্য কি কম? তার জন্য কাষ্ঠ আহরণ আনন্দ কি কম?"[৮]

ত্রিশের জীবনানন্দের কথা তিনি বলছেন না। বলবেনও না। কেননা, জীবনানন্দের কবিতাবাড়িতে দেবালয় রয়েছে, রয়েছেন ঈশ্বর-ঈশ্বরী। কিন্তু, দেবতালয়ই বিনয়ের কবিঘর, ঈশ্বরী সাধনসঙ্গিনী-গৃহিণী! তাছাড়া, পঞ্চাশের আরও অন্তত দু'জন কবিকে ঈশ্বরী বিষয়ে একটি করে আস্ত কবিতা লিখতে দেখছি। প্রথম জন কবিতা সিংহ (জ. ১৯৩২ খ্রিঃ), অন্যজন তারাপদ রায় (জ. ১৯৩৬ খ্রিঃ)। এদিকে, তারাপদ রায়ের সঙ্গে বিনয়ের যে ব্যক্তিগত পরিচয় ছিলো আমাদের জানা[৯], তবে কবিতা সিংহ বিনয়ের পরিচিত ছিলেন কিনা আমরা জানি না। মজার ব্যাপার হলো, বিনয়ের একটি গল্পে[১০] এক বাসযাত্রীর চরিত্রনামে এক কবিতা সিংহের উল্লেখ মিলছে, কথাবার্তায় 'কবিতা পরমেশ্বরী'-র কবিতা সিংহ বলেই যিনি নিজেকে দাবি করেছিলেন। বিনয় ও ঈশ্বরীর ভৌমলোক বিহারের পূর্বে কবিতা সিংহ ও তারাপদ রায়ের লেখা কবিতাদু'টি একবার দেখে নেব—

ক. "কাব্যের ঈশ্বর নেই আছেন ঈশ্বরী!

তিনি একা, তিনি নিরীশ্বর!
ঈশ্বরী কি ধ্বনি দেন? চক্ষুহীন, কর্ণবিহীন?
না তিনি দেখান তাঁর অঙ্গুলি-হেলনে
চক্ষুষ্মান, সশরীর — কবিতা-চেহারা!

তিনি তো ভূমণ্ডলে শ্রেষ্ঠ নিষ্ঠুরা,—তিনি
তীব্র অপমান মুদ্রা, নীলবর্ণ করতলে করেন ধারণ

দু হাতে বিলান নির্বাসন।
ঈশ্বরী কাব্যের যিনি, সাকার তমসা তিনি
তিনি ঘোরঅমা!

অর্ধ দৃষ্টিপাতে তাঁর মানচিত্র ঘুরে যায় ক্রুদ্ধ-মহাকাশে,
ব্রহ্মাণ্ড বিদীর্ণ হয়, নীহারিকা পুনর্বিন্যাসে, ভাঙে গড়ে
বজ্রনখ বক্ষ ফাঁড়ে ঊর্ধ্ব থেকে, ক্রমান্বয়ে অধঃ
তিনিই সৃজন দেন, এক এক হরফ নেয় রক্তের শরীর
করোটি বিদীর্ণ করে,— আরাধ্য অক্ষর!

বৃথা শব্দে পাপী যত, ছদ্ম পূজারী,— তিনি
তিন নেত্রে করেন দাহন,
ক্বচিৎ কখনো কেউ, ফিরে আসে উৎকীর্ণ পাথর হাতে

বজ্রে উৎপাটিত,

যেমন ‘সেনাই’ থেকে নেমে এসে একেলা ‘মোজেস’

পৃথিবীর জন্য দেন স্বর্লোকের দশটি নির্দেশ!”[১১]

খ. “একেকদিন একেকজন রমণীকে ঈশ্বরীর মতো

মনে হয়, মনে হয় এর হাতে ভাগ্য ভবিষ্যত

সমর্পণ করে এক জন্ম চোখ বুজে ভাসা যায়,

যে কোনো স্রোতের মুখে ভাসা যায় যে কোনো সলিলে

ছন্নছাড়া নিরুদ্দেশ যে কোনো জীবনে।

সমস্ত পথের শেষে

বাড়ি আছে, সমস্ত বাড়ির মধ্যে ঘরদোর আছে;

একেকজন রমণীর চোখে ঘর-বাড়ি-দোর-পথ

সব স্পষ্ট দেখা যায়।

একেকদিন ঈশ্বরী সকালে

দিন বড় ভালো কাটে। অন্ধকার মঠের ভিতরে

চরণামৃতের জন্য হাত পেতে আছি, যেন ফুল,

সিক্ত বেলপাতার গন্ধ একেকদিন ঈশ্বরীর পাশে।”[১২]

বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিক্ষত পঞ্চাশের দশক কি তাহলে ঈশ্বরীর দশক! ঈশ্বরে মনুষ্যত্ব কিংবা মানবাত্মায় ঈশ্বর-সন্ধানই কি ওই দশকের তছনছ-মনের আগুন ওঠা কবিতাপ্রক্রিয়ার অংশ? বিনয় তাঁর দশকের বিপন্ন-সন্দিগ্ধ চেতনা এবং ছদ্ম-নিশ্চিন্তির স্তরান্যাসের এক্সটেনশন কর্ড! ঈশ্বরীর সঙ্গে দশকের পর দশক ধরে একলাবাস করে গেলেন তিনিই, অন্যরা নন— তাঁদের কাছে ঈশ্বরীর ইমেজেটি মুহূর্তিকা। সত্তরের গনগনে দিনের তুষার আবার তাঁদের ঈশ্বরীর মধ্যে কাঠ-আবেগশূন্যতা দেখেছিলেন—

‘‘আকন্দের দিন এলে বারবার পরাজিত হই আমি গোলাপের কাছে

গোলাপের দিন এলে আমি কী সহজে মরে যাই।

আমাদের যুগ আর আমাদের জয়ের ঈশ্বরী হাই তোলে

মাছবাজারের পাশে বসে আমরা মূর্ছা গিয়েছিলাম যে-সব

অল্পস্বল্প মনে পড়ে, গোলাপ! গোলাপ!

আমরা কি মরব না কোনোকালে?[১৩]

বিনয়-বৈকুণ্ঠের একটি প্রাক্-পথ রয়েছে— ‘নক্ষত্রের আলোয়’ (প্র.প্র.কা. ১লা আশ্বিন, ১৩৬৫; দেবকুমার বসু কর্তৃক ‘গ্রন্থজগৎ’, ৬ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কোলকাতা-১২ থেকে প্রকাশিত)। এই প্রথম-কবিতার বইটি প্রথম প্রেমিকের নিঃসঙ্গতা, শরীরাভিলাষ, বিমর্ষতা, ঠুনকো জিজ্ঞাসা, সান্ত্বনার ওষধি প্রভৃতির অন্বয়ে গঠিত। ‘চিরদিন একাএকা’[১৪], ‘কুঁড়ি’[১৫], ‘নক্ষত্রের আলোয়’[১৬], ‘রৌদ্রে’[১৭], ‘সে’[১৮], ‘কেন মনোলীনা’[১৯], ‘তোমার দিকে’[২০], ‘প্রজাপতি’[২১] নামক প্রেমের কবিতাগুলি বিনয়কে চেনানোর জন্য তখনও যথেষ্ট নয়। বিনয়ের কবিতাভাষা তখনও জীবনানন্দের ‘ক্ষতিকর’ রশ্মিরেখ এড়াতে পারেনি। এমনকী, আঙ্গিকগত ক্ষেত্রেও জীবনানন্দের থেকে নেওয়া তাঁর ঋণলেখ অত্যন্ত স্পষ্ট। জীবনানন্দের ব্যবহৃত ও পাঠকের ইন্দ্রিয়ে গেঁথে থাকা বহু শব্দকেই বিনয় তাঁর কবিতায় প্রয়োগ করেছেন। উক্ত কবিতাগ্রন্থের শেষ মানে ‘আর শোনায়োনা’ নামের কবিতাটি অনুবাদ-কবিতা। ‘পুনর্বসু’ পত্রিকা [(সম্পা.) স্বপন ঘোষ, প্যাটেলনগর ভাষা মহম্মদ বাজার, বীরভূম থেকে প্রকাশিত]-র শরৎ-হেমন্ত সংখ্যায় প্রকাশিত একটি সাক্ষাৎকারে বিনয় নিজেই জানিয়েছেন যে, এই কবিতাটি আলেকজান্ডার সের্গিয়েভিচ পুশকিন (১৭৯৯ খ্রিঃ-১৯৩৭ খ্রিঃ)-এর একটি কবিতার তর্জমা। মূল কবিতার স্থাননাম ‘জর্জিয়া’-কে বিনয় বদলে করেছেন সিংহল।[২২] কিন্তু, ‘সিংহল’ কেন? উপকূলবর্তী বা দ্বীপ অঞ্চলের নামগোত্র আরও তো ছিলো। কিন্তু, জীবনানন্দের বিখ্যাত ‘বনলতা সেন’-এ উল্লিখিত ‘সিংহল’ নামটিই যেন বা কোনও ইচ্ছেয়-অনিচ্ছেয় বিনয়ের কলমে, বিনয়ের কবিতার শব্দমালায় এসে পড়েছে!

‘গায়ত্রীকে’ কাব্যগ্রন্থের নামকরণটি নারীনাম-সম্বলিত। এই সময়ই বিনয়ের অ-লোকপ্রতিভা প্রথম আলোক-বিচ্ছুরণ করছে। নারী-আশ্রয়ী প্রেমজ এই পঙক্তিগুলোর অধিকাংশই টগবগে তরুণ বিনয়ের পথ হাঁটার ও দিন কাটার ভেতর থেকে উঠে আসা। এই সম্বোধন বা উচ্চারণের বৈশেষিকী অবশ্যই সাফল্যমণ্ডিত জীবনপরিকথা নয়। পৃথিবীর একটি প্রেমের কবিতাও আসলে পাওয়ার কথা বলে না। প্রেমে জীবন, অপ্রেমে কবিতা— ‘প্রেমের কবিতা’ শব্দটাই

তাই সোনার পাথরবাটির মতো শুনতে! গণেশ বসু বিনয় সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলছেন—"বিনয় মজুমদার মগ্নচৈতন্যের কবি। বিযুক্তির বেদনায় তিনি আচ্ছন্ন, সংযুক্তির আর্তি-ও তাই ধরা পড়ে তাঁর রচনায়। তিনি স্বীকার করেন, 'সময়ের সঙ্গে বাজি ধরে পরাস্ত হয়েছি।' কখনো কখনো জীবনানন্দীয় ক্লান্তির বিস্তার-ও ঘটে।..."[২৩]

প্রেমের কবিতার যে ভাষ্য বিনয় নির্মাণ করলেন তাতে গাণিতিক-দার্শনিক বুদ্ধিযুক্তি রয়েছে, কিন্তু, তা কখনওই হৃদয়সংবেদ বা হৃদয়সংবাদকে দলিত করছে না; সমুদ্রশৈলের মতো জেগে আছে ইন্দ্রিয়-অনুভূতির সনাতনতা ও কেন্দ্রীয় স্নায়ুর আদিম অবাধ্য সিগনাল :

"সুস্থ মৃত্তিকার চেয়ে সমুদ্রেরা কত বেশি বিপদসঙ্কুল।

তারো বেশি বিপদের নীলিমায় প্রক্ষালিত বিভিন্ন আকাশ।

এ-সত্য জেনেও তবু আমরা তো সাগরে আকাশে

সঞ্চারিত হতে চাই, চিরকাল হতে অভিলাষী,

সকল প্রকার জ্বরে মাথা ধোয়া আমাদের ভালো লাগে ব'লে।

তবুও কেন যে আজো, হায় হাসি, হায় দেবদারু,

মানুষ নিকটে গেলে প্রকৃত সারস উড়ে যায়।"[২৪]

'গায়ত্রীকে'-র প্রথম প্রকাশকও 'গ্রন্থজগৎ'-এর দেবকুমার বসু, সময়টা ২৪শে ফাল্গুন ১৩৬৭, ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাস। তাঁর রুশ ভাষা শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিকতার কাল ১৯৫৭-য় শেষ হয়েছে। রুশ ভাষায় বিনয়ের দক্ষতা এমন উচ্চতা ছুঁয়ে ফেলে যে চাইলে অনেক রুশ নাগরিককেই তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফেলতে পারতেন। সে-সময়কার সাহিত্যিকরা ছিলেন নেহাতই ভূলোকনিবাসী, একালের মতো e-লোকের বাসিন্দা তাঁরা হতে পারেননি। তাঁদের অর্কুট-ফেসবুক, হোয়াট্স অ্যাপ-হাইক-টেলিগ্রাম-মেসেঞ্জার কোনওটাই ছিলো না। পরিবর্তে ছিলো মনের গহনতল থেকে উঠে আসা 'সাড়ে চুয়াত্তর' দিব্যি-দেওয়া চিঠি। বিনয় রুশ ভাষায় আলাপচারিতায় সড়গড় হতে রাশিয়ায় বেশ কয়েকজন 'পত্রবান্ধবী' পাতিয়েছিলেন। কিন্তু, এটাও ঠিক যে, এদের মধ্যে 'পত্রবন্ধু' নেই কেউ, বা থেকে থাকলেও কোথাও উল্লেখ নেই, সকলেই ভিন্নলিঙ্গ, একজন কবির পক্ষে তা-ই ঔচিত্য হয়তো! বিনয়ের নিজের লেখাতেই তাঁর 'পত্রমিতালি'-র 'গোপন কথাটি' রয়েছে। লিখছেন—

ক. "লুদমিলা চরনিখ, গোরোদ সলিকাঝসক

উরালস্কি ও বলাস্ত, এস. এস. এস. এর।

এই ছিল ঠিকানা মেয়েটি আমার বান্ধবী;

বান্ধবী মানে নেহাতই পেন ফ্রেন্ড

মনে করা যাক সে যে বেঁচে আছে আজো।

আমি যেখানে বাস করি সেই স্থান থেকে

লুদমিলাকে চিঠি লিখতাম রুশভাষাতে তার মানে

আমার এ ঠিকানাটি লুদমিলার কাছে আছে।

চিঠি লিখতাম লুদমিলাকে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে।

আমার একখানা ফোটোগ্রাফও

লুদমিলাকে পাঠিয়েছিলাম।"[২৫]

খ. "পৃথিবীতে থাকাকালে ইরা চারোভা-কে আমি

চিঠি লিখতাম।

বিশুদ্ধ রুশ ভাষাতে; অমলা চারোভা,

দ্যাখ দেখি বোঝো নাকি কাণ্ড কারখানা।

কাণ্ড মানে যে কোনো গাছের কাণ্ড আর কারখানা

মানে হলো ঠাকুরনগরে

গ্রিল বানাবার কারখানা।

পৃথিবীর লুদমিলা চরনিখ মহিলার যে ঠিকানা সেই

একই ঠিকানাটি,

মোট নয়জন পেন ফ্রেন্ড রুশ দেশে

~~ঊনিশ'শ~~ [উনিশশ'] আটান্ন সালে ছিল

সকলের নাম মনে নেই।”[২৬]

গল্পের অভ্যন্তরীণ গল্প আর আমাদের কিছু জানা নেই। তবে বিনয়ের প্রেমচেতনার সংপূর্তিতে গায়ত্রীর পাশাপাশি এই রাশিয়াবাসিনীরাও কিঞ্চিৎ গুরুত্বপূর্ণ। নাহলে, মাত্র অনূর্ধ্ব ত্রিশেই বিনয় এত ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন কেন? বলছেন— “অনেক সন্ধান ক’রে নীতি নয়, প্রেম নয়, সার্থকতা নয়,/ পেয়েছি আহত ক্লান্তি—ক্লান্তি, ক্লান্তি শুধু।/ শুনেছি যে কতিপয় পতঙ্গশিকারী ফুল আছে।/ অথচ তাদের আমি এত অনুসন্ধানেও এখনো দেখিনি।/ তাঁবুর ভিতরে শুয়ে অন্ধকার আকাশের বিস্তার দেখেছি।/ জেনেছি, নিকটবর্তী এবং উজ্জ্বলতম তারাগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে/ সব গ্রহ, তারা নয়, তাপহীন আলোহীন গ্রহ।/ আমিও হতাশাবোধে, অবক্ষয়ে, ক্ষোভে ক্লান্ত হয়ে/ মাটিতে শুয়েছি একা—কীটদষ্ট, নষ্ট খোসা, শাঁস।/ হে ধিক্কার, আত্মঘৃণা, দ্যাখো কী মলিনবর্ণ ফল।// কিছুকাল আগে প্রাণে, ধাতুখণ্ডে সুনির্মল জ্যোৎস্না পড়েছিলো।/ আলোকসম্পাতহেতু ~~বিদুৎসঞ্চার~~ [বিদ্যুৎসঞ্চার] হয়—বিশেষ ধাতুতে হয়ে থাকে।/ হায়রে, পায়রা ছাড়া অন্য কোনো ওড়ার ক্ষমতাবতী পাখি/ বর্তমান যুগে আর মানুষের নিকটে আসে না।/ সপ্রতিভভাবে এসে হাত থেকে দানা খেয়ে ফের উড়ে যায়।/ তবুও সফল জ্যোৎস্না চিরকাল মানুষের প্রেরণাস্বরূপ।/ বিশেষ অবস্থামতো বিভিন্ন বায়ুর মধ্য দিয়ে/ আমরা সতত চলি; বিষাক্ত, সুগন্ধি কিম্বা হিম/ বায়ু তবু শুধুমাত্র আবহমণ্ডল হয়ে থাকে।/ জীবনধারণ করা সমীরবিলাসী হওয়া নয়।/ অতএব হে ধিক্কার, ~~বৈদুতিক~~ [বৈদ্যুতিক] আক্ষেপ ভালো তো,/ অতি অল্প পুস্তকেই ক্রোড়পত্র দেওয়া হয়ে থাকে।”[২৭]

‘গায়ত্রীকে’-র প্রেমের কবিতাগুলিতে দার্শনিকতার সঙ্গে শরীরপ্রয়াসকেও বিনয় অনন্যতার সাবল্য ও সাবলীলত্বে মিলিয়েছেন আর তা এতটাই শিল্পিত যে, কখনওই তাকে অনাবশ্যক সুড়সুড়ি বলে মনে করার উপায় নেই। সাহিত্যজীবনের শুরুতেই এই সংযম দেখাতে পারা যে-কারওর বেলায়ই প্রশংসনীয়। বিনয়ের কবিতায় গোমড়া ব্যক্তিত্বের মানুষের চাঙর খসে গিয়ে আদল ধরে ইন্দ্রিয়-পরবশ আদত ব্যক্তিটি কিংবা পোশাকের আবডালের অসহায় পশুটি, যে নাকি সমাজ ও সামাজিক রীতিবন্ধনের সঙ্গে ঝগড়া-আপসে ক্ষয়ে-ক্ষয়ে যাচ্ছে। কয়েকটি উদাহরণ তোলা যাক :

ক. “সকল ফুলের কাছে এত মোহময় মনে যাবার পরেও
মানুষেরা কিন্তু মাংস রন্ধনকালীন ঘ্রাণ সবচেয়ে ভালবাসে।”[২৮]

খ. “চরম আনন্দময় আদানপ্রদানকালে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে থাকো,

তা আবার অন্ধকারে, শিল্পায়ন চিরকাল অন্ধকারে হয়।”[২৯]

গ. “কেবলি বিষয়বস্তু খুঁজে খুঁজে অবশেষে কবি ভেবে দ্যাখে,
সমগ্র বৎসরব্যাপী প্রকৃত মানুষদের প্রজননঋতু।”[৩০]

ঘ. “রাফ্লেসিয়া গাছ রূপে এতটা মাংসের মতো যাতে
মাছিরা ভুলবশত তাতে এসে ভিড় ক’রে থাকে।”[৩১]

ঙ. “ঋতুস্রাব বন্ধ হলে যতই সঙ্গম করি, সখি,
সন্তানলাভের আশা-সম্ভাবনা শূন্য হয়ে থাকে।”[৩২]

বিনয় কবিতার থেকে যে ধরনের স্মরণযোগ্য পঙক্তির প্রত্যাশা করতেন, তাঁরই ‘আপনি আচরি ধর্ম...’ উদ্দিষ্ট কবিতাংশগুলি। তাঁর এ-পর্বের কবিতার বিন্যাস ধ্রুপদী। সেই ধ্রুপদিয়ানার সঙ্গে শরীরী পাখনার খেলা মেলাবার সাহসী হিসেবিয়ানাই বিনয়কে আলাদা করেছে।

কখনও অপরিচ্ছন্ন দেয়ালের দিকে মনোযোগ দিলে বিশৃঙ্খলা থেকে কোনও মানুষীর মুখ ফুটে উঠতে দেখেন”[৩৩]; কিন্তু, ব্যথায় বিনত হয়ে যান এই জেনে যে, “যারা চিত্রকর নয়, তাদের শৌখিন শিল্পে আলেখ্যের মুখে/ নাক, চোখ, ওষ্ঠ, চুল—মানুষের এ-সকল বস্তু আঁকা হয়;/ কিন্তু তবু সে মুখের অধিকারিণীর রূপ আলেখ্যে আসে না।”[৩৪] সকল কবিই আসলে ব্যর্থ চিত্রশিল্পী, সকল প্রেমিক আসলে বিফলহৃদয়ের বিনিময়ী, আর এই বোধ থেকে উঠে আসে সমুদ্রতরঙ্গ এসে চিরকাল মৃত্তিকাকে চিত্রিত করেছে,/ অথচ মানুষ আজো জলপৃষ্ঠে দাগ দিতে পারেনি—পারে না।”[৩৫]-র মতো উচ্চারণ। এভাবে ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে যাবার পর মনে হবে শরণ বলে কিছু নেই, একমাত্র স্মরণ সত্য :

“একটি চুম্বক ভেঙে খণ্ড খণ্ড করা হলে তার
প্রত্যেক খণ্ডই এক সম্পূর্ণ চুম্বক হয়ে যায়।
নিকটে অমূল্য, রত্ন নিয়ে যদি পথ চলো

কী এক উৎকণ্ঠা যেন সর্বদা পীড়িত ক'রে থাকে।

রাত্রিতে যে সব স্থানে বাতাস আবদ্ধ হয়ে থাকে—
নদীবক্ষে সমধিক কুয়াশায় জন্ম হয়ে যায়।
পৃথিবীর দেহ থেকে সহসা বাতাস লোপ পেলে
সকল জীবন, ফুল ধ্বংস হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক।

চিত্রেরো জীবন আছে, সামাজিক মেলামেশা আছে;
মেশার ক্ষমতা যদি চ'লে যায় তবে চিত্র পরিত্যক্ত হয়।
জানো তো, বকুল ফুল শুকিয়ে খয়েরি হয়ে গেলে
মালায় গ্রথিত হয়, দীর্ঘস্থায়ী, গাঢ়গন্ধ মালা হতে পারে।"[৩৬]

অর্থাৎ মানুষের চলন-বলন-বিকলন— এ'সবের সাময়িকতা দীর্ঘ স্থায়িত্বে আটকা পড়ে শব্দের বাগানে।...এই বকুল ফুলের উল্লেখ বিনয়ের আরও কবিতায় পাই। 'ফিরে এসো, চাকা'-র '৩৪' সূচক কবিতার শেষটি : "...বকুল বৃক্ষের দিকে চাই,/ অত্যন্ত নিবিড়ভাবে চেয়ে দেখি, যে-শাখায় কলি/ একবার এসেছিলো, সে-শাখায় ফুটবে কি দ্বিতীয় কুসুম?"[৩৭] 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা'-র '৩' সূচক সুদীর্ঘ কবিতাটি[৩৮] সম্পূর্ণতই বকুল-বিষয়ক। সেখানে, বকুল ফুলকে কবি যোনির প্রতীকে দেখেছেন। এ-দেখা আকারগত এবং বকুলের নাম করে তাঁর চলে যাবার আর্তিটিও কামনাব্যঞ্জক। আজাদ কবি অবশ্য বকুল ফুলকে শিশুতোষ রচনারই উপকরণ করেছিলেন।[৩৯]

যাক সে-সব।... 'গায়ত্রীকে'-র বিস্তার ও বিস্ফার 'ফিরে এসো, চাকা' (প্র.প্র.কা. ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২ খ্রিঃ; দেবকুমার বসু কর্তৃক 'গ্রন্থজগৎ' থেকে প্রকাশিত)-য়। এখানে বিনয়ের প্রেমভাবনার সর্বাত্মক প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর মানসিক অসুস্থতাজনিত বিড়ম্বনা কাব্যটির নির্মাণে একাদিক্রমে ব্যঘাত ঘটালেও তার ভিত, মিনার বা গম্বুজে গভীর ক্ষতদাগ সে-অর্থে নেই। আছেন বিজিত ও বাজে খরচের সাচ্চা কবিমানুষটি, গ্লানিহীনভাবে যিনি মানসমহালের ধুলো ঝাড়তে নেমেছেন। কবি অভিযাত্রী, পরিদর্শক-পর্যটক তাঁরা হন না। বলেন—

"মস্তিষ্কে সামান্যতম সাধ নিয়ে ক্লিষ্ট প্রজাপতি
পাখাময় রেখাচিত্র যে-নিয়মে ফুটিয়ে তুলেছে
সে-নিয়ম মনে রাখো; ঢেউয়ের মতোন খুঁজে ফেরো।
অথবা বিম্বের মতো ডুবে থাকো সম্মুখীন মদে।
এমনকি নিজে-নিজে খুলে যাও ঝিনুকের মতো,
ব্যর্থ হও, তবু বালি, ভিতরে প্রবিষ্ট বালিটুকু
ক্রমে-ক্রমে মুক্তা হয়ে গতির সার্থক কীর্তি হবে।
শয়নভঙ্গির মতো স্বাভাবিক, সহজ জীবন
পেতে হলে ঘ্রাণ নাও, হৃদয়ের অন্তর্গত ঘ্রাণ।"[৪০]

বিনয় কী আর চেয়েছেন হৃদয়যাপন ও হৃদয়রসপানের সামান্য চাহিদাটুকু ছাড়া! সামান্যতার মধ্যেই তিনি মান্যতার পর্যাস গুনছেন। বুনছেন "হে আলেখ্য, অপচয় চিরকাল পৃথিবীতে আছে;/ এই যে অমেয় জল—মেঘে মেঘে তনুভূত জল—/ এর কতোটুকু আর ফসলের দেহে আসে বলো?/ ফসলের ঋতুতেও অধিকাংশ শুষে নেয় মাটি।/ তবু কী আশ্চর্য, দ্যাখো, উপবিষ্ট মশা উড়ে গেলে/ তার এই উড়ে যাওয়া ঈষৎ সংগীতময় হয়।"[৪১] বা, "বলেছি এভাবে নয়, দৃশ্যের নিকটে এনে দিয়ে/ সকলে বিদায় নাও; পিপাসার্ত তুলি আছে হাতে,/ চিত্রণ সফল হলে শুনে নিও যুগল ঘোষণা।/ অথবা কেবল তুমি লিপ্ত হলে সমাধান হয়।/ মেলার মতোন ভিড়ে তবে তুমি—আমরা এখনো/ ক্রমাগত বাধা পাই প্রাত্যহিক হৃদয়যাপনে।/ সৃষ্টির পূর্বাহ্নে, দ্যাখো, নিজেকেই সৃষ্টি করা প্রয়োজন হয়।/ পরিচিত সূর্য আরো বেশি আকর্ষণশীল হলে/ হয়তো সমুদ্রবক্ষে এমন জোয়ার এসে যেতো/ যাতে সব বালিয়াড়ি, প্রবালপ্রাচীর পার হয়ে/ জলরাশি হৃদয়ের কাছে এসে উপস্থিত হতো।/ অর্থাৎ কেবল তুমি লিপ্ত হলে সমাধান হয়।"[৪২] কিংবা, "আমাদের অভিজ্ঞতা সিক্ত গিরিখাতের মতোন/ সংকীর্ণ, সীমিত; এই কদিন যাবত কুয়াশায়/ মেঘে সব ঢেকে আছে—উপত্যকা, অরণ্য, পাহাড়।/ পৃথিবীতে বহুবিধ আহার্য রয়েছে, তবু বলো, বিড়ালের ব্যর্থতর জিহ্বা তার কতো স্বাদ পায়?/ অথচ তীক্ষ্ণতা আছে, অভিজ্ঞতাগুলি সূচিমুখ,/ ফুলের কাঁটার মতো কিংবা অতি দূর নক্ষত্রের/ পরিধির মতো তীক্ষ্ণ, নাগালের অনেক বাহিরে।/ যা-ই হোক, তা সত্ত্বেও বিশাল আকাশময় বায়ু,/ বিশাল বাতাস বয়, বিরুদ্ধ বাতাসে বেঁধে যায়।/ সর্বদা কোনো-না-কোনো স্থানে, দেশে ঝড় হতে থাকে।/ এ-

সকল অনিশ্চিত অস্থিরতা, দ্বন্দ্ব ভেদ ক'রে/ তবুও পাইন গাছ, ঋজু হয়ে ক্রমে বেড়ে ওঠে,/ প্রকৃত লিপ্সার মতো আকাশের বিদ্যুতের দিকে।"[৪৩]-এর মতো প্রসক্ত শব্দশিহর। প্রেমের এই 'sexual and beyond sex' লিপিকরণে বিনয় অনন্য, পিতাপৌত্রহীন।

কাগজের ভগ্নাংশে নিহিত তাঁর এই সৃষ্টিগুলো যেন যুবনাশ্বের বেদনাকর প্রতিবেদন, হাঁটা ও হোঁচট যেখানে সমার্থক। "এতকাল মনে হতো, তুমিও এসেছো অভিসারে—/ চাঁদের উপর দিয়ে স্বচ্ছ মেঘ ভেসে-ভেসে গেলে/ যেমন প্রতীতি হয়, মেঘ নয়, চাঁদ চলমান।/ এখন জেনেছি সব, তবুও প্রয়াস প'ড়ে আছে।"[৪৪] বা, "জীবনে ব্যর্থতা থাকে; অশ্রুপূর্ণ মেঘমালা থাকে;/ বেদনার্ত মোরগের নিদ্রাহীন জীবন ফুরালো"[৪৫] বা, "অত্যন্ত নিপুণভাবে আমাকে আহত করে রেখে/ একটি মোটরকার পরিচ্ছন্নভাবে চ'লে গেলো।"[৪৬] বা, "কবেকার নিমজ্জিত জাহাজের প্রেমে ভুলে থাকি,/ ভুলে থাকি বর্তমান রসোত্তীর্ণ মালা ও মদিরা।"[৪৭] বা, "প্রত্যাখ্যাত প্রেম আজ অসহ ধিক্কারে আত্মলীন।/ অগ্নি উদ্গমন ক'রে এ গহ্বর ধীরে-ধীরে তার/ চারিপাশে বর্তমান পর্বতের প্রাচীর তুলেছে।"[৪৮] বা, "আমাকে ডাকে না কেউ নিরলস প্রেমের বিস্তারে।"[৪৯] ইত্যাদি পঙক্তি মনস্থ ভাঙচুর থেকে উঠে আসা, ঝড় থেমে গেলে প্রথম দফার হুতাশে যার জন্ম। দ্বিতীয় দফায় (যেহেতু কালকেই তাঁর মৃত্যু হচ্ছে না!) সমস্ত টুকরো-বিটুকরোগুলোকে গুছিয়ে নিতে-নিতে ফেরবার জমাট বাঁধতে চান— ভালোবাসার বশীকরণ নয়; ঘৃণা, বেতোয়াক্কা ও প্রতিশোধস্পৃহায়। তার প্রকাশ "আর অন্ধকার নয়, আর নয় অবাঞ্ছিত ছায়া।/ উন্মুক্ত স্বস্থানে স্থিত, বৃক্ষাবলি অধিক সংখ্যায়/ ফুল, ফল পেয়ে থাকে, ফসলের উপচার পায়।/ এবার উন্মাদ হবো, অবশেষে উন্মত্ত নখরে/ খুলে নেবো পলাতকা পরিটির ঠিকানা, দরজা।/ ইলোরার চিত্রাবলি, হরিণের মাংসের মতোন/ বিলম্বিত ব্যবহার পাবো আমি জিহ্বায়, জগতে, এরূপ বিরহী ভয় যথার্থই হয়েছে আমার।/ তবে তুমি গুহাচিত্র, নিঃসন্দেহে দীর্ঘায়ু, সফল।/ আর অন্ধকার নয়, আর নয় অবাঞ্ছিত ছায়া"[৫০] বা, "কেন এই অবিশ্বাস, কেন আলোকিত অভিনয় ?/ কী আছে এমন বর্ণ, গন্ধময়; জীবনের পথে,/ গ্রন্থের ভিতরে আমি বহুকাল গবেষক হয়ে/ লিপ্ত আছি, আমাদের অভিজ্ঞতা কীটের মতোন।/ জানি, সমাধান নেই; অথচ পালঙ্করাশি আছে,/ রাজকুমারীরা আছে—সুনিপুণ প্রস্তরে নির্মিত/ যারা বিবাহের পর বারংবার জলে ভিজে-ভিজে/ শৈবালে আবিষ্ট হয়ে সরস শ্যামল হতে পারে।/ এখন তাদের রূপ কী আশ্চর্য ধবল লোহিত।/ অকারণে খুঁজে ফেলা ; আমি জানি, নীল হাসি নেই।/ জঠরের ক্ষুধা-তৃষ্ণা, অট্টালিকা স্বচ্ছলতা আছে/ সফল মালার জন্য; হৃদয় পাহাড়ে ফেলে রাখো।"[৫১] কিংবা, "ভালোবাসা দিতে পারি, তোমরা কি গ্রহণে সক্ষম?/ লীলাময়ী করপুটে তোমাদের সবই ঝ'রে যায়—/ হাসি, জ্যোৎস্না, ব্যথা, স্মৃতি, অবশিষ্ট কিছুই থাকে না।/ এ আমার অভিজ্ঞতা। পারাবতগুলি জ্যোৎস্নায়/ কখনো ওড়ে না ; তবু ভালোবাসা দিতে পারি আমি।/ শাশ্বত,

সহজতম এই দান—শুধু অঙ্কুরের/ উদগমে বাধা না দেওয়া, নিষ্পেষিত অনালোকে রেখে/ ফ্যাকাশে হলুদবর্ণ না-ক'রে শ্যামল হতে দেওয়া।/ এতই সহজ, তবু বেদনায় নিজ হাতে রাখি/ মৃত্যুর প্রস্তর, যাতে কাউকে না ভালোবেসে ফেলি।/ গ্রহণে সক্ষম নও। পারাবত, বৃক্ষচূড়া থেকে/ পতন হলেও তুমি আঘাত পাও না, উড়ে যাবে।/ প্রাচীন চিত্রের মতো চিরস্থায়ী হাসি নিয়ে তুমি/ চ'লে যাবে; ক্ষত নিয়ে যন্ত্রণায় স্তব্ধ হবো আমি।"[৫২] প্রভৃতি পঙক্তিতে।

প্রেয়সীকে উদ্দেশ করে নিরুদ্ধ আহত কবির সত্তান্তর ঘটে, ঘটতে থাকে। নিজেকে কখনও শিশু, কখনও বালক, কখনও তরুণ, কখনও বা বৃদ্ধ বলে ভাবেন। বদলে চলা এই মানসিক বয়ঃদশাগুলি অবশ্যই প্রতিরোধের ওজনের উপর নির্ভর করে তিনি মন-মন তৈরি করেছেন। তিনি জীবনের কথা ভাবেন; জানেন যে, ক্ষত সেরে গেলে ত্বকে পুনরায় রোমোদ্‌গম হয় না; বিমর্ষ রাত্রির মাছির মতো শান্ত বেদনাটি বালকের ঘুমের ভিতরে অস্থানে প্রস্রাব করার মতো ঝরে যেতে পারে[৫৩]। এই বলেও আবার জটিলতা, প্রতিঘাত বালকের আগ্রহে নিজের করার কথা বলেন! এখানে, কবিতা ও পদার্থবিদ্যার মিশ হয়। আর্কিমিডিসের শরণাপন্ন হয়ে বিনয় হৃদয়ের গুরুভার জলে নিমজ্জিত অবস্থায় লঘু করে নেবার পিচ্ছিল সাধ করে পদাহত হয়ে ফেরেন[৫৪]। ওদিকে তিনি ঠিকানা হারিয়ে ফেলা শিশু[৫৫] বা বিলীয়মান শবকে জাগাতে চাওয়া সন্ধে থেকে সচেষ্ট শিশুটি[৫৬]। ব্যক্তিগত পবিত্রতাহীন বিপন্ন বিনয়ের যেন যেখানে-সেখানে মুগ্ধ মলত্যাগে অথবা শিশুর মতো অসীমে প্রস্রাবকালে লুকোছাপা নেই[৫৭], সে শুধু জরায়ু ত্যাগের পরে বিস্তীর্ণ আলোকে এসে সৃষ্টির সদর্থ বোঝে[৫৮]। কিন্তু তাঁর মনজাতা তাঁকে শিশু ভেবে ফেললেই তিনি মন-কাড়া আবদারে নুয়ে যান— "তুমি যেন ফিরে এসে পুনরায় কুণ্ঠিত শিশুকে/ করাঘাত ক'রে ক'রে ঘুম পাড়াবার সাধ ক'রে/ আড়ালে যেও না; আমি এতদিনে চিনেছি কেবল/ অপার ক্ষমতাময়ী হাত দুটি, ক্ষিপ্র হাত দুটি—/ ক্ষণিক নিস্তারলাভে একা একা ব্যর্থ বারিপাত।/ কবিতা সমাপ্ত হতে দেবে নাকি? সার্থক চক্রের/ আশায় শেষের পঙক্তি ভেবে ভেবে নিদ্রা চ'লে গেছে।/ কেবলি কবোষ্ণ চিন্তা, রস এসে চাপ দিতে থাকে;/ তারা যেন কুসুমের অভ্যন্তরে মধুর ঈর্ষিত/ স্থান চায়, মালিকায় গাঁথা হয়ে ঘ্রাণ নিতে চায়।/ কবিতা সমাপ্ত হতে দাও, নারি, ক্রমে—ক্রমাগত/ ছন্দিত, ঘর্ষণে, দ্যাখো, উত্তেজনা শীর্ষলাভ করে,/ আমাদের চিন্তাপাত, রসপাত ঘটে, শান্তি নামে।/ আড়ালে যেও না যেন, ঘুম পাড়াবার সাধ ক'রে।"[৫৯] "পর্দার আড়ালে থেকে কেন বৃথা তর্ক ক'রে গেলে—/ আমি ভগ্ন বৃদ্ধ নই, বিড়ম্বিত সমৃক্ত তরুণ।/ এই যে ছেড়েছি দেশ, সব দৃশ্য, পাহাড়, সাগর—/ এতে কি বিশ্বাস হবে; কোনোদিন মদ্যপান ক'রে/ মাতালের আর্ত নেশা হয়তো হৃদয়ঙ্গম হবে—/ লুপ্ত সভ্যতার কথা স্বীকারের মতো সার্থকতা।"[৬০] বলেন, আর এই ব্যহত তারুণ্য তাঁকে টেনে নিয়ে যায় অকালগ্রহণের দিকে :

“বড়ো বৃদ্ধ হয়ে গেছি, চোখের ক্ষমতা ক’মে গেছে
পরস্পর মিশে থাকা কাচপুঁতি এবং নীলার
পার্থক্য নির্ণয় করা এখন সম্ভব নয় আর।
এখন কি কাগজের নৌকা নির্মাণের পদ্ধতিও
ভুলে গেছি, কবিতার মিল খুঁজে মন্থর প্রহর
চ’লে যায়, সন্ধ্যাকালে শুনেছি শীতের পুরোভাগে
মৃত্তিকাসংলগ্ন মেঘ এখনো কুয়াশারাশি ব’লে
অভিহিত হয়—এই কুৎসাভীত বহু ভালোবাসা।
অভিজ্ঞতা ফুরিয়েছে; অন্ধকারে আহার্যবিহীন
ক্ষুধায় অতিবাহিত করা ভিন্ন বৃক্ষদের কোনো
গত্যন্তর নেই, হায়, এই ক্লেশে ম্রিয়মাণ আমি।
হেঁটেছি সুদীর্ঘ পথ; শুধু কাঁটা, রক্তাক্ত দু-পায়
তোমার দুয়ারে এসে অনিশ্চিত, নির্বাক, চিন্তিত।
তুমি কি আমাকে বক্ষে স্থান দিতে সক্ষম মুকুর?”[৬১]

মুকুর তো তাঁর ‘মিরর ইমেজ’ (**Mirror Image**), তাঁর যে-‘আমি’ উলটো পক্ষের; অহং (**Ego**) কিংবা পরাহং (**Super Ego**)-এর তর্জনীটি! যে রথচক্রে তাঁর যূথচক্র পূর্ণতা পেতো, তাঁকে ডাকবাংলায় ‘চাকা’ সম্বোধন করেই তাঁর এ-কাব্য। পৃথিবীতে বহু গান গাওয়া শেষ হলে, সুর শুনে, ব্যথা পেয়ে, কানে-কানে মৃদু অর্ধস্ফুট কথা চেয়ে তিনি ‘চাকা’-র দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়ান[৬২]। এখানে একটা কথা অবশ্য-উল্লেখের দাবিকর যে, তাঁর প্রেমের কবিতায় তাঁর উপস্থিতি ভীষণরকম জড়িত। এককের তাড়িত ও অতিসম্ভাবক ভাষণ সেগুলি নয়। প্রসঙ্গত, ‘ফিরে এসো, চাকা’-র নাম একসময় ‘আমার ঈশ্বরীকে’ (প্র.প্র.কা. ১৩ জুন, ১৯৬৪ খ্রিঃ) হয়েছিলো, ‘আমার ঈশ্বরীকে’-র সবকটি কবিতাই আবার ‘ঈশ্বরীর কবিতাবলী’ (প্র.প্র.কা. ১৫ই শ্রাবণ, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ, ৩১ জুলাই, ১৯৬৫ খ্রিঃ)-তেও ছিলো। কবি পুড়ে যান, জুড়ে থাকতে চান তাও ‘ঈশ্বরী’-র প্রতীতি ও প্রেমে। বলছেন— “কবিতা লিখেছি কবে, দু-জনে

চকিত চেতনায়।”[৬৩] এই সুরটিই তাঁকে তৃষার ’পরে, ভুখের ’পরে মৃত্যুর কিছু আগেও জয়জন্ম দেবে।[৬৪]

‘ফিরে এসো, চাকা’-র কবি পণ্যের তলানিতে ডুবে যেতে বসা ভোগবাদী পৃথিবীর জন্য রেখে গিয়েছেন উপভোগবাদী, একই সঙ্গে টেম্পোরাল ও টাইমলেস শ্রেষ্ঠ এই প্রেমের উচ্চারণটি : “আমি মুগ্ধ, উড়ে গেছো, ফিরে এসো, চাকা,/ রথ হয়ে, জয় হয়ে, চিরন্তন কাব্য হয়ে এসো।/ আমরা বিশুদ্ধ দেশে গান হবো, প্রেম হবো, অবয়বহীন/ সুর হয়ে লিপ্ত হবো পৃথিবীর সকল আকাশে।”[৬৫] ‘বিশুদ্ধ দেশ’ বলতে যে ভাবরাষ্ট্র বোঝাচ্ছে, তার তত্ত্বগঠনটি নিয়ে বিনয়ের আগে-পরে কেউ ভাবতে চেয়েছেন বা পেরেছেন বলে মনে হয় না। ‘স্ত্রী’ (বিমল মিত্রের উপন্যাস অবলম্বনে)-র মাধব দত্ত নামধারী জমিদাপুরুষ (ছবিতে উত্তমকুমার; জিততেও তাঁর আনন্দ, ঠকতেও তাই!)-এর চরিত্রে যে চারিত্রিকতা ছিলো, নিম্নলিখিত কবিতাটি বিনয়কে অনেকটা তেমন করেই চেনায়; বিনয় সেই বিরল-ব্যক্তিত্ব, প্রত্যায়ক দুঃখরাতের রাজা :

“সুরায় উন্মত্ত হয়ে পদাঘাতে পুষ্পাধারটিকে
বিচূর্ণ করেছি; কোনো পরিতাপ রাখিনি হৃদয়ে।
এখন টেবিল রবে অন্তর্গত কাগজে আবৃত।
দিনগুলি চ’লে যাবে রহস্যের সমাধানে, যাবে
উপচীয়মান কিছু বৎসর; বয়স বাড়ুক।
মাটি খুঁড়ে যেতে হবে; মাটির গভীরে ইতস্তত
সভ্যতার অবশেষ খুঁজে পাই, পেয়েছি অনেক
পোড়া ইট, পুতুলের অবয়ব, ভগ্নপ্রায় বুক।
মানুষেরা আজ যেন নিরুপম সম্রাটশিকারে
ব্যস্ত আছে; নানারূপ ছলা-কলা মিথ্যার আশ্রয়ে
কোনোভাবে কিছু কাল বিনষ্ট করায় আস্থাবান।
জান্তব আগ্রহে দ্যাখে অশ্বের ভয়ার্ত গতিবেগ—
কখন সে শ্রান্ত হবে, ধরা দেবে এই প্রতীক্ষায়।

সম্রাট বলে কথা, রহস্যের সমাধানে থাকে।''[৬৬]

তাঁর আমিষাশী তরবারগুলি[৬৭] অর্থাৎ এ-গ্রন্থের কিছু কবিতার পঙক্তির ভিতরস্থিত মেদমদ্য সেই ক্ষেত্রে আর মুখ্য থাকে না।...

'অধিকন্তু' (প্র.প্র.কা. ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৭ খ্রিঃ, দেবকুমার বসু কর্তৃক ১৯ পণ্ডিতিয়া টেরাস, কোলকাতা-২৯ থেকে প্রকাশিত) কাব্যটি আসলেই কবি ও তাঁর প্রস্তাবিত 'ঈশ্বরী'-র মধ্যের যৌথ ঘরকন্নার চিত্র। 'ঈশ্বরীর' পর্বে বিনয় সত্যি-সত্যিই ভাবতেন যে, তিনি ঈশ্বরীর স্বামী। তাঁর চিন্তাক্ষেত্রে ঈশ্বরীই যেন বইটি বুনে দিয়েছে। বইটিতে এ-কথা বিনয় লিখেওছিলেন— '...প্রকৃতপক্ষে এই কাব্য, কবিতাসমূহ ঈশ্বরীর স্বরচিত, আমি তার লিপিকার স্বামী।'[৬৮] এই বোধ, এই বক্তব্যটিই কেবল নামকরণ থেকে ক্রিয়াকরণে নেমে এলো 'অধিকন্তু'-র কবিতায়। আর সংক্রমিত অবস্থায় আমাদেরও পুরো বইটিকেই যুগ্ম সম্পাদনা মনে হবে! পূর্বোক্ত গ্রন্থে কবি প্রেমের যে অবয়বহীন পরিশুদ্ধতার কথা বলেছিলেন, সেখানে অলংকরণ ছিলো, এখানে এলো তার ব্যখ্যার বিস্তার। ''অবয়ব মুক্ত হলে সরল শূন্যতা প'ড়ে থাকে,/ নিশ্চিন্ততা প'ড়ে থাকে—অবয়ব অস্বীকার ক'রে,/ ঈশ্বরী, যেমন পাই আগুনের পরিবর্তে অগ্নিহীনতাকে।''[৬৯] লিখেই লিখে ফেললেন প্রেমের কবিতার আশ্চর্য দার্শনিক আখ্যানটি :

''আমার ও ঈশ্বরীর প্রায়াবচেতনা আর অতিচেতনার
ক্ষণিক চিন্তার ফলে, দীর্ঘস্থায়ী কামনার ফলে উভয়েই
বস্তুকে বিলীন হতে এবং বস্তুকে জাত—আবির্ভূত হতে
দেখেছি অনেকবার, আরো চিরকাল এই দেখার প্রত্যাশা—
সত্য ও সুন্দর সাধ মনে নিয়ে আমাদের মনের আলোকে
সচেতন চিন্তা থেকে উভয়ের সচেতন কামনা থেকেও
যেন ভবিষ্যতে বস্তু জন্ম পায়, এবং বিলয়প্রাপ্ত হয়
যেন মহিমার মতো ঈশ্বরী ও ঈশ্বরের ঐশ্বর্যের মতো হয়ে রয়।''[৭০]

তাঁদের দু'জনের মননের একত্র-পথটি এক্ষণ পার করে পরেকার ঘটনার রূপ, প্রকৃতি ও গতিধারা নির্ধারণ করে[৭১]। মস্তিষ্ক-উর্বর মন দেখতে পায় ''কবিতাগুলি বিকশিত হয়ে বিশুদ্ধ গণিত হয়ে গেছে।''[৭২] কিন্তু, কবির প্রেমিক-পরিচয়টিও তো একেবারে উপেক্ষা করতে পারছেন না কবি— ''...চিন্তাজগতের/ সর্ববিধ জটিলতা সরল সহজবোধ্য হয়ে গিয়ে ঈশ্বরীর কাছে/

অলস কালোপযোগী ক্রীড়ার বিষয় হয়ে থেমে/ ব'লে যায় আমাদের উজ্জ্বলতা চিরায়ত প্রেমে/ আমাদের চিরায়ত প্রেমের ঐশ্বর্য পেয়ে আর সবই ভুলে যেতে পারি/ ঈশ্বর নারীও নিজে— বাচনক্ষমতাবতী সুপ্রত্যক্ষা নারী।''[৭৩]

বিনয় 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা' (প্র.প্র.কা. শ্রাবণ **১৩৮১** খ্রিঃ, অরুণা বাগচী কর্তৃক 'অরুণা প্রকাশনী' থেকে প্রকাশিত) একটি প্রতীকাশ্রিত চিত্রকল্পময় গ্রন্থ। আশ্চর্যবর্ণন ও প্যাঁচালো সিঁড়ির মতো গ্রন্থনা সিডিউস (**Seduce**), ফোরপ্লে (**Foreplay**) ও ইন্টারকোর্স (**Intercourse**) অর্থাৎ সেক্স মেকিং (**Sex Making**)-এর বিভিন্ন ধাপগুলিকে যেন প্রথমেই ঠিক বুঝে উঠতে দেয় না! বিনয়ের প্রেমভাবনা এখানে বিকশিত হয়েছে এ'ভাবে—

''যত বেশি স্পষ্ট ক'রে মানসনেত্রের মাঝে কল্পনাকে দেখি

ঠিক ততো স্পষ্ট এক বাস্তব প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টি হয়ে থাকে।

মানসনেত্রের দেখা দৃশ্যই এ-বাস্তবের দৃশ্যাবলী হয়,

সেই হেতু এ-অঘ্রান আমাদের জননের প্রকৃষ্ট সময়।

মানসসুন্দরীগুলি এ-প্রকারে সুখ পায়, ব্যথা পেতে পারে;

.....''[৭৪]

নারী ও পুরুষের সম্পর্কের অন্তর্ময়তাটি নিয়ে তিনি ভাবিত হয়েছেন। তাঁর নিজের জীবন দিয়ে তিনি দেখেছেন একদল যুবক-যুবতীর সঙ্গে সখ্য ও অন্তরঙ্গ ভাব হওয়ার পর কেমন হঠাৎ করেই সব শেষ হয়ে যায়। পরে কখনও আবার দেখা হলে মনেই হয় না যে তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব, প্রখর দিবালোকে কাঁদা-হাসা কখনও ছিলো। কবিমন ব্যথা পায়, মনে সন্ধে নামে, রাত নামে, নতুন একটি দলের সঙ্গে পুনরায় ঘনিষ্ঠতা হয়। জীবনান্ত ইস্তক এই টানভাবটি থেকে যাবে ভাবেন, কিন্তু আবার সব ভাঙে, কে যে কোথায় ছিটকে যায়, তারা আর কোনও খবরে থাকে না। তখন বিনয়ের মনে হয়—

''রমণ না ক'রে কোনো রমণী ও পুরুষের বন্ধুত্ব টেকে না,

খুব বেশিদিন ধ'রে তাদের বন্ধুত্বভাব কখনো টেকে না।''[৭৫]

তাঁর অনুভূত অঘ্রানে দেহ ও মনের মধ্যের প্রভেদটি এরপর ক্রমলুপ্ত হয়, কবির সাকার দেহ ও নিরাকার মন একাকার হয়ে নিষ্যূত একাত্মিকা রচনা করে—

"শরীরই অন্তর আর অন্তরই শরীর—এই অনাদি একের থেকে সৃষ্টি হয়েছিলো
সব-কিছু আলো, ব্যোম, সময়, কবিতা, দেহ একদিন হয়েছিলো; কথা ছিলো হবে
পুনরায় কবে যেন; অকস্মাৎ শিহরিত হ'য়ে মনে হ'তে থাকে আজ তাই হ'লো।
গান গেয়ে উঠি আমি, গানের হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বর অনুসারে সেই স্বরবর্ণগুলি
যেমন হ্রস্ব ও দীর্ঘ হয়েছিলো একদিন, স্বর সুর তেমনই এক হ'য়ে স্বরলিপি আসে।"[৭৬]

১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে অতি কম সময়ের ব্যবধানে 'ঈশ্বরীর' [প্র.প্র.কা. ৩১শে ভাদ্র, ১৩৭১ (১৯৬৪)] কবিতাগ্রন্থের তিনটি সংস্করণ বিনয় নিজস্ব প্রকাশনায় প্রকাশ করেছিলেন। 'ঈশ্বরীর' নামক কবিতার বইয়ের তৃতীয় সংস্করণটিতে থাকা প্রতিটি লেখাই 'ঈশ্বরীর কবিতাবলী'-তে গৃহীত হয়েছে। 'ঈশ্বরীর' দ্বিতীয় সংস্করণে 'প্রেম বাকি থাকে' নামে একটি কবিতা ছিলো, প্রথম সংস্করণে যা ছিলো না, তৃতীয় সংস্করণে যা বর্জিত হয়েছে। ঈশ্বরী কি একা? ঈশ্বরীর সীমাহীন একাকিত্বের কথা ভেবে তাঁর কান্না পায়, মাথা ধরে, শান্তিভঙ্গ হয়। বলেন— "অথচ বাঁচার জন্য, মৃত্যুর পরে বেঁচে থাকা/ ইত্যাদির জন্য তার পুরনো প্রেমের প্রয়োজন/ কিছু ছিলো, অতিশয় সহজ সরল প্রণয়ের—/ সহজ সরল প্রেম, রঙের মতোন প্রেম নয়,/ রেশমের মতো প্রেমও নয়।/ আজ তার একা লাগে, বড়ো একা লাগে,/ বিরহের একাকীত্ব নয়,/ অসীম শূন্যের মাঝে নিঃসঙ্গতা হেতু/ যেরকম একা একা লাগবার কথা/ সেরকম একা একা লাগে তার, বড়ো ভয় হয়।"[৭৭] কবিতাটি ১৯৬৪ খ্রিঃ-র ১৯ সেপ্টেম্বরে লিখিত। ওই একই দিনে লেখা অন্য একটি কবিতায় ঈশ্বরীর ভালোবাসাবিষয়ক শীতলতাটি নিয়ে উষ্মা নয়, বিধ্বস্ত বিনয় প্রকাশ করছেন দুঃখ—

"ভালোবাসবার ইচ্ছা কোনোদিন তার হয় নাই।
ভালোবাসবার সাধ কোনোদিন তার হয় নাই।
অপরের ভালোবাসা তার মোটে ভালো লাগে নাই।
প্রেমকে পদদলনের চেষ্টা করেছে সতত;
অথচ ছায়ার মতো সে প্রেম পায়ের নিচে না প'ড়ে উপরে
থেকে গেছে, সবিনয়ে লুটে গেছে প্রেমের নিয়মে।
ভালোবাসবার সাধ কোনোদিন তার হয় নাই।

.....

ভালোবাসবার ইচ্ছা কোনোদিন তার হয় নাই।

অপরের ভালোবাসা কোনোদিন তার মোটে ভালো লাগে নাই।”[৭৮]

তার দু’দিন আগের অর্থাৎ ১৭ সেপ্টেম্বরের একটি কবিতায় ঈশ্বরীর সীমায়িত সীমাহীনতাটি নিয়ে বিনয় নিজেরই মনে প্রশ্ন জেগে ছিলো— “যদিও একাকী তবু ঈশ্বরী কি আমার সহিত/ একত্রিত, সম্মিলিত জীবনযাপন ক’রে যাবে?/ যদিও একাকী তবু ঈশ্বরী কি দেহহীনতার/ পরিণামরূপে শুধু প্রেমে সব সার্থকতা পাবে?”[৭৯] তবু, ত্রিলোকেশ্বর ঈশ্বরীই তাঁর লালাটিক ধ্যান-অনুধ্যান : সময়, স্বপ্ন ও সম্ভাবনা। এখান থেকেই উঠে আসে “চৈতন্যোদয়ের পরে এই বলি, ঈশ্বরী কখনো/ স্বর্গে কিম্বা মর্ত্যে যদি কোনো ভুলত্রুটি ক’রে থাকি/ তবে তুমি দয়া ক’রে বিনা শর্তে ক্ষমা করো, সখি,/ আরও কাছে টেনে নাও, চিরকাল একত্রিত হয়ে থাকো—এই/ আমার সর্বদা সত্য অনুরোধ, তোমার নিকটে।”[৮০] বা, “আনন্দিত নিয়মেরা, আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছারা/ স্বকীয় মাধ্যমে স্নিগ্ধ ভালোবাসা ব্যক্ত ক’রে যায়—/ দেহহীন সব সত্তা, পক্ষপাত প্রীত তারকারা,/ সময় আকাশ আলো ঐশ্বরিক প্রতিভায় জ্বলে,/ বিশ্বের প্রতিটি বস্তু তাদের পবিত্র প্রতিষ্ঠায়/ পৃথিবীতে আজ এক বিস্ময় সঞ্চার ক’রে চলে।/ প্রখ্যাত প্রাণীরা দ্রুত লুপ্ত হবে, ঈশ্বরী-ঈশ্বর/ দুজনে অবোধ্যভাবে নির্ভুল, প্রস্থান চিন্তারত।”[৮১] বা “চিরায়ত গণিতের সর্বোচ্চ শাখাটি আমি এবং ঈশ্বরী—/ সর্বত্র বিরাজমান, বিশ্বের সকল কিছুতেই/ রূপ ও শক্তি হয়ে বিদ্যমান আছি দুজনেই।/ কানের ভিতরে কারো হৃৎপিণ্ড শব্দ করে শুনি/ শুয়ে শুয়ে, ফলে ভাবি, স্বভাবত ভেবে যেতে হয়—/ পরস্পর ভালোবেসে শুয়ে আছি ঈশ্বরী ও আমি ও সময়।”[৮২] বা, “...আমার ঈশ্বরী রয়েছেন;/ আমি তাঁর ভৃত্য, বন্ধু, সহচর, স্বামী ও প্রণয়ী—/ একাই সকল কিছু, অধিকন্তু রয়েছেন দেবদেবীগণ।”[৮৩] অথবা, “...আমাদের প্রকৃত সম্পদ,/ যথাযথভাবে কী কী সে সকল স্থির ক’রে নিয়ে/ দুজনে অনেক কিছু ইতিমধ্যে সঞ্চয় করেছি।/ আমি ঈশ্বরীর স্বামী, এতটা পেয়েই আমি খুসি।[৮৪] অথবা, “ঈশ্বরীর কথাগুলি শশব্যস্ত শব্দোৎসারণ/ ব’লে মনে হতে থাকে, এবং সে কথাগুলি যেন/ আমারই মনের কথা,...”[৮৫]-র মতো প্রস্রুত পঙক্তিরা এবং কবি পৃথিবীপৃষ্ঠে পুঁতে দেন প্রেমের অ-কালিক নিশানদিহিটি—

“আমার কোলের চেয়ে বেশি উচ্চ, সম্মানিত কোনো

আসন এ-বিশ্বে নেই, আর সে-আসন ঈশ্বরীর।”[৮৬]

কিন্তু বিনয়, একটু বাদেই এক উল্লিঙ্গ সাধের আসন পেতে বসেন নিশানপ্রান্তে—

“পিছু ফিরে শুয়ে থাকা, নীরবতা, উদ্যত মিনতি,

উত্থান, বলপ্রয়োগ, অব্যন্তরে মারামারি, টেপা—

এমন পরীক্ষা দিই, কদাচিৎ দিতে হয় ব'লে—

ভালো ক'রে চেপে ধরি, চেপে ধ'রে বোতল সাফাই

করার মতোন মারি, আলোড়ন ঈশ্বরীর প্রাণে

ছড়িয়ে জড়িয়ে যায়, টের পায় কাকে ভালোবাসে।

যত হাসি—লালনীল স্মিত হাসি বিশ্বে বিলিয়েছে

অবশেষে উচ্ছ্বসিত চমৎকৃত হয়ে তার গালে ফিরে আসে।''[৮৭]

এই ধরনের কবিতাকে বিনয়ের 'বাল্মীকি'-পর্বের মক্‌শ কিংবা মহড়া বলা যেতে পারে, সম্ভোগ যেখানে উপভোগের প্রধান মাধ্যম। এ-সময় তাঁর কবিতার অভিরুচি সঙ্গ থেকে সঙ্গমের উদ্দেশ নিচ্ছে। তৎসত্ত্বেও, অন্তত একটি কবিতায় বিনয় আরও একবার তাঁর প্রেম ও প্রেমাস্পদকে দার্শনিকতায় মুড়তে, বাঁধতে পারছেন— ''আমিও অনেকবার ঈশ্বরের দর্শন পেয়েছি/ দেখেছি ঈশ্বরকেই বৈদ্যুতিক আলো জ্বেলে রেখে/ দুয়ার জানালা সব বন্ধ করে ঘরের ভিতরে।/.../ ঈশ্বরকে শুধুমাত্র চোখে দেখে তাকে লাভ করা অসম্ভব,/ বস্তুত ঈশ্বর মধ্যে ঢুকে গেলে তাকে পাওয়া হয়।/ প্রত্যেকের এইরূপ ব্যক্তিগত ঈশ্বর রয়েছে/ এবং নারীরা তাকে চাক্ষুষ দেখাতে পারে, দেখিয়েও থাকে।''[৮৮]

বিনয়ের 'বাল্মীকি'-পরবর্তী পর্যায়টিতে ব্যক্তিক প্রেমভাবনার পাশাপাশি নারীর প্রেমমনস্তত্ত্বের দিকটিও কবির-ভাবনা পেয়েছে। বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে স্বভাবতই তাঁর প্রেমে ধরেছে পাক, প্রেমের আত্মচেতন বদলে যাচ্ছে চেতনদর্শনে। যিনি বলেছিলেন— ''বিশ্বস্রষ্টা তোমাদের সৃষ্টি ক'রে পরে/ বলেছেন, 'বাস মরো বিশ্বের ভিতরে/ পৃথিবীতে, সকলেই যা খুশি তা করো।/.../ তোমাদের গড় আয়ু কত হবে তা তো/ ঠিক ক'রে দিলাম না, যাও প্রেমে মাতো।/...''[৮৯]; তিনিই বললেন— ''...বুড়ো হয়ে গেছি, নারী/ দেখলে আর কোনো আকর্ষণ বোধ করি না।/ 'শুধু আশা কোনোদিন জীর্ণ বৃদ্ধ হবো।/ মৃত্তিকায় পড়ে রবে বয়োত্তীর্ণ রসহীন বীজ,/ উৎসুক হবে না কেউ ধ্বংসপ্রাপ্ত দেবতার শবে।'/ এই দেবতাটি কে?''[৯০]

কখনও পুরুষের ওপর নারীর অত্যধিক আধিপত্যের আফিম এবং ফলস্বরূপ নারী ও পুরুষ উভয়েরই স্বভাবধর্মের অদলবদলটি বিনয়কে ভাবিয়েছে। স্বচক্ষে দেখা একটি প্রেমের সম্পর্ককে দৃষ্টান্ত করে তিনি লিখছেন—''এক ভদ্রমহিলার প্রতি চেয়ে প্রায়শই দেখি/ মহিয়সী হরিণীরও চেয়ে বেশি সপ্রতিভভাবে/ কোনো এক পুরুষের ঘনিষ্ঠতা টেনে নিয়ে আসে।/ সকলি

সহজ ছিলো, অকস্মাৎ কী কারণে যেন,/ হয়তো বা মালিকের কথা ভেবে কথঞ্চিৎ ভয়ে/ আলোকের থেকে দূরে আঁধারের আড়ালে দাঁড়ালো।/ কী হলো জানি না, তবু আহা কী আশ্চর্য রীতি মতো/ পুরুষের মুখ থেকে মোলায়েম নারী-কণ্ঠ শুনি।/ নারীটি পুরুষ যেন মোটা স্বরে কথা কয়ে যায়।/ তাদের আলাপ বড়ো ভালো লাগে, আশ্চর্য এমন,/ হরিণীরও চেয়ে বেশি সপ্রতিভ লাস্যময়িতায়/ সম্মুখে দেখিয়ে দিলো ঘাস শুধু ঘাস প'ড়ে আছে—/ শতাব্দী শতাব্দীব্যাপীসুবিস্তৃত ঘাসের আশ্রয়ে/ কার যেন রুদ্ধকণ্ঠ স্বপ্নাবলী চুপে শুয়ে আছে।"[৯১] একটি কবিতায়, 'হল অব ফেম'-ও কীভাবে নারী ও পুরুষকে নিকটগত করে, দেখাচ্ছেন— "এঞ্জেলা লাক্সবারিকে আমি দেখেছি/ লোকে বলবে কেন, আমিও বলব 'হ্যাঁ/ সিনেমায় দেখেছি।'/ আমাকে নিয়ে একজন বাঙালিনী কবিতা/ লিখেছিল এবং উৎসর্গ করেছিল আমাকে।/ কবির নাম মণিমালা দাশগুপ্তা, তার/ বইয়ের নাম 'কামরাঙা'। আমি কখনো/ মণিমালাকে দেখিনি।"[৯২] এই ধরনের নিকটবর্তিতায় এক দুর্মর, অবোধ্য আকর্ষণ রয়েছে বই কি! বিনয়ের কয়েকটি কবিতা আছে, যেখানে নারীমনের বিচিত্রিতাই আসলে কবির শব্দাভিমুখের নিয়ন্তা-নিয়ামক সেজে বসে :

ক.

"কিলবার্ণ কোম্পানির অফিস দেখেই আমি লাফ মেরে উঠি,
তাড়াতাড়ি চ'লে আসি এই গ্রামে শিমুলপুরেই।
সে অনেক বৎসর আগেকার কথা তার পরে
তেরশ আটানব্বুই বঙ্গাব্দের ফাগুন এখন
আমার হাতের কাছে কোলগেট টুথপেস্ট,
বাম হাত দিয়ে আমি ধরি
এ টুথপেস্টের এই টিউবকে এবং তখন
মনে আসে সে যুবতী নারীটির কথা
সে তো বলেছিলো এই চারমিনারের
মানে তো, বিনয়বাবু, আসলে ইনার চার্ম
সে যুবতী এতদিনে বৃদ্ধা হয়ে গেছে।[৯৩]

খ. ‘‘আমাদের কফি হাউসে’

অন্তত দেড়শো জন লোকের সামনে বসে

একজন যুবতী একজন যুবকের হাতে হাত বোলায়

আর রবীন্দ্রসংগীত শোনায়—‘তুমি কেমন করে

গান কর হে গুণী...’

যুবতীটি সবার সামনেই যুবকটির হাতে বহুক্ষণ যাবৎ

হাত বোলায় আর বোলায় আর বলে—‘আপনি আমার

দাদার মতো।’

এবং যুবতীর বোন আরেক যুবতী কফি হাউসের

টেবিলের নীচে যুবকটির পা দুই পা দিয়ে

জড়িয়ে ধরে সবার সামনেই, কফি

হাউস ভর্তি লোকের সামনেই। এ করে প্রত্যহ

অর্থাৎ পাঠকগণ আমার মতে সব মেয়েই একটি

‘মানসিক হাসপাতাল।’’’[৯৪]

গ. ‘‘খুনিদেরই যুবতীরা ভালোবাসে বলে

মনে হচ্ছে।

জুলিয়াস সিজার অন্তত একশোজন

লোক খুন করে

ক্লিওপেট্রার কাছে গিয়ে বলল ‘আমি

বীর পুরুষ, শ' খানেক লোক খুন করেছি

তোমাকে পাবার জন্য। তুমি আমাকে [আমার?] ক্লিওপেট্রা।'

এবং কী আশ্চর্য ক্লিওপেট্রা সিজারের

কথা শুনে তাকে তাড়িয়ে না দিয়ে

সিজারকেই বিয়ে করল।

আমাদের ভারতবর্ষেও কৃষ্ণ

বেশ কয়েকটি লোক খুন করে ষোলোশো

গোপিনী পেয়ে গেল। এবং ভারতে লোকেরা বলে

'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ'।''[৯৫]

বিনয় মারতে জানেন না। বরং নিজের জন্য মরণকে প্রস্তুত করতে সময় নিয়েছেন এক জীবন! বিয়ে নিয়ে কিছু আগাম ঘোষণা তাঁর কোনদিনও ছিলো না, আর কোনও কীর্তিমান প্রতারণাও তাঁর দ্বারা হয়নি।[৯৬] তিনি, তারা ও নারী সম্পর্কে তাঁর অভিমতটি ছিলো এমনই— ''আমি যুবতীদের শুধু মুখ ভালোবাসি।/.../ আমার ধারণা হয়েছে যে আমি ছাড়া অন্যান্যরা/ ভালোবাসে মেয়েদের (যুবতীদের) মুখ বাদ দিয়ে বাকি শরীর।''[৯৭]

তিনি বিনয় মজুমদার, তিনি এটা জানেন, মুকুরকে 'মনে রেখো' বলে ফায়দা নেই। কেননা, তার সামনে থেকে সরে গেলে বুকে তার চিহ্ন থাকে না, সে কোনও চিহ্ন রাখে না। তাই মুকুরকেই জাদুবলে স্মরণক্ষম পায়রা বানানো তাঁর ফলবতী প্রয়াস। এখন :

''এক মন্দিরের দ্বারে লেখা আছে তোমার এবং

আমার নামটি তবু এ মন্দিরে তুমিও থাকো না

আমিও থাকি না কিন্তু মন্দিরে তো আমাদের বিগ্রহ রয়েছে।

এই কথা জেনে নাও সুদূর আমেরিকাতে ব'সে।''[৯৮]

যুক্তরাষ্ট্রবাসী এই 'তুমি'-টি সন্দেহ নেই গায়ত্রী চক্রবর্তী, যাঁকে বইয়ের পাতায় একত্রাসনে বেঁধে তিনি দিনশেষের শেষ খেয়া পাড়ি দিতে চাইবেন[৯৯]। গ্রন্থই কবির মন্দির, গ্রন্থের অক্ষরগুলিই বিগ্রহ।... কিন্তু, তারকাদিষ্ট কবির মনিত-মনসুবাটি ছিলো এই—

“আমাকে তারারা বলে ‘বিনয়দা, বেদনা ভুলুন,

প্রেম হলো নুন।’

আমিও নিজেকে তাই বলি

তারাদের কথা মতো চলি।”[১০০]

ভুলতে পারলেন কি? তা সফল হলে আর কবিতা হতো না, হয় না। ভাগ্যিস...!...

তথ্যসূত্র :

১. কাজী নজরুল ইসলাম; ৮০ সূচক গান; (কাব্য-গীতি); নজরুল-গীতি (অ.); (সম্পা.) আবদুল আজীজ আল্-আমান; হরফ প্রকাশনী; ষষ্ঠ সংস্করণ : ৪ জুন ১৯৯৯ শুক্রবার, ১৯ নফর ১৪২০, ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৬; কলকাতা - ৭০০০০৭; পৃ. ১৯

২. বিনয় মজুমদার; 'উন্মোচনের গান'; (কা.গ্র. নক্ষত্রের আলোয়); কাব্যসমগ্র (প্রথম খণ্ড); (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রতিভাস; তৃতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারি, ২০০৬ (বইমেলা); কলকাতা-২; পৃ. ২৮

৩. ঐ; 'একমাত্র ভালোবাসা'; (কা.গ্র. 'কবিতা বুঝিনি আমি'); কাব্যসমগ্র (প্রথম খণ্ড); (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রতিভাস; প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ ১৪০৯, এপ্রিল ২০০২; কলকাতা-৭০০০০২; পৃ. ২২৭

৪. অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত; 'তাইরেসিয়াস'; দেবীকে স্নানের ঘরে নগ্ন দেখে; প্রতিভাস; প্রথম প্রতিভাস সংস্করণ : বইমেলা, জানুয়ারি, ২০০৪; কলকাতা-৭০০০০২; পৃ. ১৩

৫. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত; 'মানুষ ঈশ্বর হবে'; উত্তরায়ণ; (সম্পা.) নিরঞ্জন চক্রবর্তী; গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড; দ্বিতীয় সংস্করণ : ১লা মাঘ, ১৪১০/ ১৬ই জানুয়ারী, ২০০৪; কলকাতা- ৭০০ ০ ৭৩; পৃ. ৮০

৬. জীবনানন্দ দাশ; 'গোধূলি সন্ধির নৃত্য'; (কা.গ্র. 'সাতটি তারার তিমির'); শ্রেষ্ঠ কবিতা; ভারবি; দশম মুদ্রণ : শ্রাবণ ১৪১০, আগস্ট ২০০৩; (প্র. পূর্ণেন্দু পত্রী); কলকাতা-৭৩; পৃ. ৮১

৭. ঐ, '১৯৪৬-৪৭', (অগ্র.), ঐ, পৃ. ১১৯

৮. রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী; 'সামন্ততান্ত্রিক'; (কা.গ্র. 'ভাদ্রপদ'); মাতৃকাবর্ণেরা এস; কবিতীর্থ; প্রথম প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা জানুয়ারি ২০১০, মাঘ ১৪১৬; কলকাতা-২৩; পৃ. ১২৯-১৩০

৯. বিনয় মজুমদার; 'আত্মপরিচয়'; কাব্যসমগ্র (প্রথম খণ্ড); (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রতিভাস; তৃতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারি, ২০০৬ (বইমেলা); কলকাতা-২; পৃ. ২২

১০. ঐ, 'কবির গল্প', বিনয় মজুমদারের ছোটগল্প, কবিতীর্থ, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৯৮, কলকাতা-২৩, পৃ. ৫২

১১. কবিতা সিংহ; 'আছেন ঈশ্বরী'; (কা.গ্র. 'বিমল হাওয়ার হাত ধরে [প্রস্তাবিত]'); শ্রেষ্ঠ কবিতা; দে'জ পাবলিশিং; তৃতীয় সংস্করণ : বৈশাখ ১৪১৬, এপ্রিল ২০০৯; (প্র. পূর্ণেন্দু পত্রী); (উৎ. শঙ্খ ঘোষকে); কলকাতা ৭০০ ০৭৩; পৃ. ১৪-১৫

১২. তারাপদ রায়; 'একেকদিন'; (কা.গ্র. 'ছিলাম ভালোবাসার নীল পতাকাতলে স্বাধীন'); ঐ; পুনর্মুদ্রণ : মাঘ ১৪২১, জানুয়ারি ২০১৫; ঐ; পৃ. ৪৭

১৩. তুষার চৌধুরী, 'গোলাপ! গোলাপ!', অগ্রন্থিত কবিতা, দেবভাষা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১২, কলকাতা ৭০০০৪০, পৃ. ২৯

১৪. বিনয় মজুমদার; 'চিরদিন একাএকা'; (কা.গ্র. নক্ষত্রের আলোয়); কাব্যসমগ্র (প্রথম খণ্ড); (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রতিভাস; তৃতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারি, ২০০৬ (বইমেলা); কলকাতা-২; পৃ. ২৯

১৫. ঐ, 'কুঁড়ি', ঐ, পৃ. ২৮-২৯

১৬. ঐ, 'নক্ষত্রের আলোয়', ঐ, পৃ. ২৯

১৭. ঐ, 'রৌদ্রে', ঐ, পৃ. ৩০

১৮. ঐ, 'সে', ঐ, পৃ. ৩০-৩১

১৯. ঐ, 'কেন মনোলীনা', ঐ, পৃ. ৩১

২০. ঐ, 'তোমার দিকে', ঐ, পৃ. ৩১-৩২

২১. ঐ, 'প্রজাপতি', ঐ, পৃ. ৩২-৩৩

২২. শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'নক্ষত্রের আলোয়', (গ্রন্থ পরিচয়), কাব্যসমগ্র (প্রথম খণ্ড) (বিনয় মজুমদার), ঐ, পৃ. ১৫২

২৩. গণেশ বসু, 'কালশুদ্ধ বাংলা কবিতা', নরকরোটিতে প্রজাপতি, মনন প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০১১, (উৎ. আশিস সান্যাল, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, দীপেন রায় ও রাণা চট্টোপাধ্যায়-কে), কলকাতা ৭০০ ০০৬, পৃ. ২৪৪

২৪. বিনয় মজুমদার; ২ সূচক কবিতা; (কা.গ্র. 'গায়ত্রীকে'); কাব্যসমগ্র (থম খণ্ড); (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রতিভাস; তৃতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারি, ২০০৬ (বইমেলা); কলকাতা-২; পৃ. ৩৫-৩৬

২৫. ঐ; ৭ সূচক কবিতা; (ন তু ন ক বি তা); শিমুলপুরে লেখা কবিতা; কবিতীর্থ; দ্বিতীয় সংস্করণ : শ্রাবণ ১৪১৯, আগস্ট ২০১২; কলকাতা-২৩; পৃ. ৩১

২৬. ঐ, ১১ সূচক কবিতা, ঐ, পৃ. ৩৫

২৭. ঐ; ৩ সূচক কবিতা; (কা.গ্র. 'গায়ত্রীকে'); কাব্যসমগ্র (প্রথম খণ্ড); (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রতিভাস; তৃতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারি, ২০০৬ (বইমেলা); কলকাতা-২; পৃ. ৩৬

এই কবিতাটিতে কিছু মুদ্রণপ্রমাদ চোখে পড়ছে। দ্বাদশ ও একবিংশ চরণের যথাক্রমে 'বিদ্যুৎ' ও 'বৈদ্যুতিক' বাননদু'টিতে 'য-ফলা' পড়েনি। কবিতাটির পরিমার্জিত সংস্করণ রয়েছে 'ফিরে এসো, চাকা' গ্রন্থে। কাব্যসমগ্রের প্রথম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত 'ফিরে এসো, চাকা'-র ৩ সূচক কবিতা (২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৬০-এ লিখিত)-টি অর্থাৎ 'গায়ত্রীকে'-র ৩ সূচক কবিতাটির যা কিনা সংশোধিত সংস্করণ, সেখানে অবশ্য এ-ভুল হয়নি।

দ্র. ঐ, ৩ সূচক কবিতা, (কা.গ্র. 'ফিরে এসো, চাকা'), ঐ, পৃ. ৪৩

অথচ, দু'টি সংস্করণেই অদ্ভুতভাবে '<u>...আক্ষেপ ভালো তো</u>,' মুদ্রিত রয়েছে, যা বাক্যের বাক্-ভঙ্গিমার অনুসারী নয়। 'ফিরে এসো, চাকা'-র অরুণা সংস্করণে কিন্তু আছে—

"অতএব, হে ধিক্কার, বৈদ্যুতিক <u>আক্ষেপ ভোলো তো,</u>

অতি অল্প পুস্তকেই ক্রোড়পত্র দেওয়া হয়ে থাকে।"

কবিতাটির শুরু থেকেই আত্মকথনের ঢঙে যেভাবে আত্মশাসন এসে মিশেছে, তাতে এর অরুণা সংস্করণটিই যথাযথ বলে মনে হচ্ছে।

দ্র. ঐ; '২১ সেপ্টেম্বর ১৯৬০'; 'ফিরে এসো, চাকা'; অরুণা প্রকাশনী; চতুর্থ মুদ্রণ : শ্রাবণ ১৪১১; (উৎ. গায়ত্রী

চক্রবর্তী); কলকাতা ৬; পৃ. ১১

এই বইয়ে কবিতা-লেখার তারিখ দিয়ে চিহ্নায়ন করা হয়েছে। উপরোক্ত কবিতাটি তৃতীয় কবিতাই।

২৮. ঐ; ৫ সূচক কবিতা; (কা.গ্র. 'গায়ত্রীকে'); কাব্যসমগ্র (প্রথম খণ্ড); (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রতিভাস; তৃতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারি, ২০০৬ (বইমেলা); কলকাতা-২; পৃ. ৩৭

২৯. ঐ, ৬ সূচক কবিতা, ঐ, পৃ. ৩৭

৩০. ঐ, ৭ সূচক কবিতা, ঐ, পৃ. ৩৮

৩১. ঐ, ১১ সূচক কবিতা, ঐ, পৃ. ৪০

৩২. ঐ, ১৪ সূচক কবিতা, ঐ, পৃ. ৪১

৩৩. ঐ, ৯ সূচক কবিতা, ঐ, পৃ. ৩৯

৩৪. ঐ, ৭ সূচক কবিতা, ঐ, পৃ. ৩৮

৩৫. ঐ, ১২ সূচক কবিতা, ঐ, পৃ. ৪১

৩৬. ঐ, ১৩ সূচক কবিতা, ঐ, পৃ. ৪১

৩৭. ঐ, ৩৪ সূচক কবিতা, (কা.গ্র. 'ফিরে এসো, চাকা'), ঐ, পৃ. ৫৬

৩৮. ঐ, ৩ সূচক কবিতা, (কা.গ্র. 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা'), ঐ, পৃ. ৯২-৯৮

৩৯. "ভালো থেকো ফুল, মিষ্টি বকুল, ভালো থেকো।
ভালো থেকো ধান, ভাটিয়ালি গান, ভালো থেকো।
ভালো থেকো মেঘ, মিটিমিটি তারা
ভালো থেকো পাখি, সবুজ পাতারা
ভালো থেকো চর, ছোটো কুঁড়েঘর, ভালো থেকো।
.....
ভালো থেকো মেলা, লাল ছেলেবেলা, ভালো থেকো।
ভালো থেকো, ভালো থেকো, ভালো থেকো।"

(খণ্ডিতাংশ)

দ্র. হুমায়ুন আজাদ, 'শুভেচ্ছা', (কা.গ্র. 'আমি বেঁচে ছিলাম অন্যদের সময়ে'), কাব্যসমগ্র, আগামী প্রকাশনী, দ্বিতীয় মুদ্রণ জুন ২০০৮, ঢাকা ১১০০, পৃ. ২৬৭

৪০. বিনয় মজুমদার; ৮ সূচক কবিতা; (কা.গ্র. 'ফিরে এসো, চাকা'); কাব্যসমগ্র (প্রথম খণ্ড); (সম্পা.) শ্রীতরুণ

বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রতিভাস; তৃতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারি, ২০০৬ (বইমেলা); কলকাতা-২; পৃ. ৪৫-৪৬

৪১. ঐ, ৬ সূচক কবিতা, ঐ, পৃ. ৪৪-৪৫

৪২. ঐ, ১০ সূচক কবিতা, ঐ, পৃ. ৪৬

৪৩. ঐ, ১৩ সূচক কবিতা, ঐ, পৃ. ৪৭-৪৮

৪৪. ঐ, ২১ সূচক কবিতা, ঐ, পৃ. ৫১

৪৫. ঐ, ২৭ সূচক কবিতা, ঐ, পৃ. ৫৩

৪৬. ঐ, ২৮ সূচক কবিতা, ঐ, পৃ. ৫৪

এই পঙক্তিটি জীবনানন্দীয় ছাঁচে ঢালা। অপ্রেমপীড়িত নগরীর রাত্রিদিনের উচ্ছল যন্ত্রজহ্লাদকে জীবনানন্দ দাশ বর্ণিত করেছিলেন এইভাবে—

"এখন দুপুর রাত নগরীতে দল বেঁধে নামে।

একটি মোটরকার গাড়লের মতো গেল কেশে"

দ্র. জীবনানন্দ দাশ; 'রাত্রি'; (কা.গ্র. 'সাতটি তারার তিমির'); কাব্যসমগ্র; (সম্পা.) ক্ষেত্র গুপ্ত; ভারবি; পুনর্মুদ্রণ : বৈশাখ ১৪১১, এপ্রিল ২০০৪; কলকাতা-৭৩; পৃ. ২৭৪

৪৭. বিনয় মজুমদার; ২৯ সূচক কবিতা; (কা.গ্র. 'ফিরে এসো, চাকা'); কাব্যসমগ্র (প্রথম খণ্ড); (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রতিভাস; তৃতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারি, ২০০৬ (বইমেলা); কলকাতা-২; পৃ. ৫৪

৪৮. ঐ, ৩১ সূচক কবিতা, ঐ, পৃ. ৫৫

৪৯. ঐ, ৪২ সূচক কবিতা, ঐ, পৃ. ৫৯

৫০. ঐ, ৩০ সূচক কবিতা, ঐ, পৃ. ৫৫

৫১. ঐ, ৩২ সূচক কবিতা, ঐ, পৃ. ৫৫-৫৬

৫২. ঐ, ৬৫ সূচক কবিতা, ঐ, পৃ. ৬৮

৫৩. ঐ, ১৪ সূচক কবিতা, ঐ, পৃ. ৪৮

৫৪. ঐ, ২৬ সূচক কবিতা, ঐ, পৃ. ৫৩

৫৫. ঐ, ৫০ সূচক কবিতা, ঐ, পৃ. ৬২

৫৬. ঐ, ৫৩ সূচক কবিতা, ঐ, পৃ. ৬৩

৫৭. ঐ, ৬১ সূচক কবিতা, ঐ, পৃ. ৬৬

৫৮. ঐ, ৬২ সূচক কবিতা, ঐ, পৃ. ৬৭

৫৯. ঐ, ৭৭ সূচক কবিতা, ঐ, পৃ. ৭৩

৬০. ঐ, ১৬ সূচক কবিতা, ঐ, পৃ. ৪৯

৬১. ঐ, ৫৬ সূচক কবিতা, ঐ, পৃ. ৬৪-৬৫

৬২. ঐ, ৭৬ সূচক কবিতা, ঐ, পৃ. ৭৩

৬৩. ঐ, ৫৫ সূচক কবিতা, ঐ, পৃ. ৬৪

৬৪. ঐ; 'আমরা দুজনে মিলে'; হাসপাতালে লেখা কবিতাগুচ্ছ; কবিতীর্থ; প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৪১০, মে ২০০৩; কলকাতা-৭০০০২৩; পৃ. ১৬

৬৫. ঐ; ৭০ সুচক কবিতা; (কা.গ্র. 'ফিরে এসো, চাকা'); কাব্যসমগ্র (প্রথম খণ্ড); (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রতিভাস; তৃতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারি, ২০০৬ (বইমেলা); কলকাতা-২; পৃ. ৭০

৬৬. ঐ, ৪১ সূচক কবিতা, ঐ, পৃ. ৫৯

৬৭. **ক.** "মাংসল চিত্রের কাছে এসে সব ভোলা গিয়েছিলো।
মদিরার মতো তুমি অজস্র যুদ্ধের ক্ষত ধুয়ে
স্নিগ্ধ ক'রে দিয়েছিলে।..."

(খণ্ডিতাংশ)

দ্র. ঐ, ৯ সূচক কবিতা, ঐ, পৃ. ৪৬

খ. "কী উৎফুল্ল আশা নিয়ে সকালে জেগেছি সবিনয়ে।
কৌটোর মাংসের মতো সুরক্ষিত তোমার প্রতিভা
উদ্ভাসিত করেছিলো ভবিষ্যৎ, দিকচক্রবাল।"

(খণ্ডিতাংশ)

দ্র. ঐ, ১৪ সূচক কবিতা, ঐ, পৃ. ৪৮

গ. "মশাগুলি কী নিঃসঙ্গ, তবুও বিষণ্ণ আশা নিয়ে
আর কোনো ফুল নয়, রৌদ্রতৃপ্ত সূর্যমুখী নয়,
তপ্ত সমাহিত মাংস, রক্তের সন্ধানে ঘুরে ফেরে।"

(খণ্ডিতাংশ)

দ্র. ঐ, ২৭ সূচক কবিতা, ঐ, পৃ. ৫৩

ঘ. "যদি যাই প্রথমেই মাংসল মালার আমন্ত্রণ,

মন নিয়ে কিছুকাল তাপ পেতে ব্যয় করেছি কি

শোনা যাবে, হীরকের মতো আমি কঠিন, নিষ্ক্রিয়।''

(খণ্ডিতাংশ)

দ্র. ঐ, ২৯ সূচক কবিতা, ঐ, পৃ. ২৯

ঙ. ''অসুস্থতাকালে এত বিচিত্র লালাময়ী স্বাদ

মনে পড়ে, জেগে রয় ঝালমত্ত আহার্যের ঘ্রাণ,

মাংসের ঝোলের সিক্ত আবাহন বুভুক্ষু শরীরে।

তারকারা ঋতুচক্রে স'রে গেছে, এ-সব বোঝেনি।''

(খণ্ডিতাংশ)

দ্র. ঐ, ৪৯ সূচক কবিতা, ঐ, পৃ. ৬২

চ. ''হৃদয় উন্মাদ হয়, মাংসে করে আশ্রয়-সন্ধান।

অথচ সুদূর এক নারী শুধু মাংসভোজনের

লোভে কারো কাছে তার চিরন্তন দ্বার খুলেছিলো,

যথাকালে লবণের বিস্বাদ অভাবে ক্লিষ্ট সেও।''

(খণ্ডিতাংশ)

দ্র. ঐ, ৭৪ সূচক কবিতা, ঐ, পৃ. ৭২

ছ. ''মুগ্ধ মিলনের কালে সজোরে আঘাতে সম্ভাবিত

ব্যথা থেকে মাংসরাশি, নিতম্বই রক্ষা করে থাকে।''

(খণ্ডিতাংশ)

দ্র. ঐ, ৭৬ সূচক কবিতা, ঐ, পৃ. ৭৩

৬৮. শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ''ফিরে এসো, চাকা'র নাম পরিবর্তন প্রসঙ্গে', (গ্রন্থ পরিচয়), কাব্যসমগ্র (প্রথম খণ্ড) (বিনয় মজুমদার), ঐ, পৃ. ১৬২

৬৯. বিনয় মজুমদার, ২ সূচক কবিতা, (কা.গ্র. 'অধিকন্তু'), কাব্যসমগ্র (প্রথম খণ্ড); (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়; ঐ; কলকাতা-২; পৃ. ৭৪

৭০. ঐ, ৬ সূচক কবিতা, ঐ, ৭৫

৭১. ঐ, ৭ সূচক কবিতা, ঐ, পৃ. ৭৬

৭২. ঐ, ১২ সূচক কবিতা, ঐ, পৃ ৭৭

৭৩. ঐ, ১১ সূচক কবিতা, ঐ

৭৪. ঐ, ১ সূচক কবিতা, অম্লানের অনুভূতিমালা, অরুণা প্রকাশনী, দ্বিতীয় মুদ্রণ : শ্রাবণ ১৪০৭, কলকাতা ৬, পৃ. ১-২

৭৫. ঐ, ২ সূচক কবিতা, ঐ, পৃ. ১০

৭৬. ঐ, ৬ সূচক কবিতা, ঐ, পৃ. ৫৩

৭৭. শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়; ('প্রেম বাকি থাকে') (বিনয় মজুমদার); ''ঈশ্বরীর' প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে'; **পরিশিষ্ট ক**; প রি শি ষ্ট মা লা; কাব্যসমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড); (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রতিভাস; প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ ১৪০৯, এপ্রিল ২০০২; কলকাতা-২; পৃ. ২৩৭-২৩৮

৭৮. ঐ, ('আমার অদেয় কিছু নেই') (ঐ), ঐ, পৃ. ২৩৬-২৩৭

৭৯. বিনয় মজুমদার, 'যদিও একাকী তবু', (কা.গ্র. 'ঈশ্বরীর'), কাব্যসমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড), ঐ, পৃ. ২০

৮০. ঐ, 'সর্বদা সত্য অনুরোধ', ঐ, পৃ. ১৫

৮১. ঐ, 'আমাদের দ্বৈতচিন্তা', ঐ

৮২. ঐ, 'রূপ ও প্রকৃতি হয়ে', ঐ, পৃ. ১৮

৮৩. ঐ, 'অসীম তারকালোকে', ঐ, পৃ. ১৯

৮৪. ঐ, 'আমি ঈশ্বরীর স্বামী', ঐ, পৃ. ২৪

৮৫. ঐ, 'আত্মার আত্মীয়', ঐ, পৃ. ২৭-২৮

৮৬. ঐ, 'ঈশ্বরীর নিরাপত্তার জন্য', ঐ, পৃ. ২৬

৮৭. ঐ, 'কম্পোজিশন', ঐ, পৃ. ২৬

৮৮. ঐ, 'ঈশ্বর', (কা.গ্র. 'বাল্মীকির কবিতা'), ঐ, পৃ. ৬১

৮৯. ঐ, 'বিশ্বস্রষ্টা তোমাদের', (কা.গ্র. 'এখন দ্বিতীয় শৈশবে'), ঐ, পৃ. ১৮৪-১৮৫

৯০. ঐ, 'আমার কবিতায় আছে', (কা.গ্র. 'আমিই গণিতের শূন্য'), ঐ, পৃ. ১৭২

৯১. ঐ, 'একটি গাধার কাহিনী', (কা.গ্র. 'ঈশ্বরীর'), ঐ, পৃ. ১৬

এ-বিষয়ে হুমায়ুন আজাদ-এর অনুভব ও অভিব্যক্তিটিও সমরূপ—

''তুমি যাকে দেহ দাও, তাকে গাধা করো

তুমি যাকে স্বপ্ন দাও, তাকে সোনা করো!''

দ্র. হুমায়ুন আজাদ, 'তুমি সোনা আর গাধা করো', সব কিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে, আগামী প্রকাশনী, তৃতীয় মুদ্রণ :

জুন ২০০৮, ঢাকা ১১০০, পৃ. ১৫

৯২. ঐ, ‘এঞ্জেলা লাক্সবারি’, (কা.গ্র. ‘আমিই গণিতের শূন্য’), ঐ, পৃ. ১৭২

৯৩. ঐ, ‘কিলবার্ণ কোম্পানির’, (কা.গ্র. ‘আমাকেও মনে রেখো’), ঐ, পৃ. ১৫৩

৯৪. ঐ; ৪ সূচক কবিতা; (‘কয়েকটি কবিতা’); ছোটো ছোটো গদ্য ও পদ্য; কবিতীর্থ; প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০৭, মাঘ ১৪১৩; কলকাতা-২৩; পৃ. ৮৯

৯৫. ঐ, ৩ সূচক কবিতা, ঐ, পৃ. ৮৮

৯৬. ঐ, ২ সূচক কবিতা, ঐ, পৃ. ৮৭

৯৭. ঐ, ১ সূচক কবিতা, ঐ

৯৮. ঐ; ‘মনে রেখো মনে রেখো’; (কা.গ্র. ‘আমাকেও মনে রেখো’); কাব্যসমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড); (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রতিভাস; প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ ১৪০৯, এপ্রিল ২০০২; কলকাতা-২; পৃ. ১৫০-১৫১

কাব্যসমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড)-এর সূচিপত্রে কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত কবিতার নামতালিকায় অবশ্য কবিতার নামটি ‘মনে রেখো, মনে রেখো’ ছাপা হয়েছে।

৯৯. ঐ; ‘আমরা দুজনে মিলে’; হাসপাতালে লেখা কবিতাগুচ্ছ; কবিতীর্থ; প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৪১০, মে ২০০৩; কলকাতা-২৩, পৃ. ১৬

১০০. ঐ, ‘বৃহৎ হীরক’, (কা.গ্র. ‘আমাকেও মনে রেখো’), কাব্যসমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড); (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রতিভাস; প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ ১৪০৯, এপ্রিল ২০০২; কলকাতা-২; পৃ. ১৫৮

কিন্তু, কবিতানামটি ‘বৃহৎ হীরক খণ্ড’ বলে মুদ্রিত রয়েছে কাব্যসমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড)-এর সূচিপত্রে, কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত কবিতার নামতালিকায়।